ISSN: 2249-4332

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 18, No. 2, December 2021

S R Lahiri Mahavidyalaya
University of Kalyani
West Bengal

ISSN: 2249-4332

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas
Volume 18, No. 2, December 2021

'Open Eyes' is a multidisciplinary **peer reviewed journal** published biannually in June and December since 2003. It is published by the Principal, Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya, Majdia, University of Kalyani, West Bengal, India on behalf of the Seminar & Research Forum. Contributed original articles relating to Social Science, Literature, Commerce and Allied Areas are considered for publication by the Editorial Board after peer reviews. The authors alone will remain responsible for the views expressed in their articles. They will have to follow styles mentioned in the 'information to the contributors' given in the inner leaf of the back cover page of this journal or in the website. All editorial correspondence and articles for publication may kindly be sent to the Jt. Editor(s).

Advisory & Editorial Board

Professor (Dr.) Barun Kumar Chakroborty
Emeritus Professor, Rabindra Bharati University, Kolkata, India.
& Ex. Professor, Department of Folklore, University of Kalyani, West Bengal, India.

Professor (Dr.) Apurba Kumar Chattopadhyay
Department of Economics & Politics, Visva-Bharati (A Central University), West Bengal, India.

Professor (Dr.) Jadab Kumar Das
Department of Commerce, University of Calcutta, Kolkata, India.

Professor (Dr.) Md. Mizanur Rahman
Department of English, Islamic University, Kushtia, Bangladesh.

Dr. Biswajit Mohapatra
Department of Political Science, North Eastern Hill University, Shillong, Meghalaya, India.

Dr. Paramita Saha
Department of Economics, Tripura University (A Central University), Tripura.

Dr. Prasad Serasinghe
Department of Economics, Faculty of Arts, University of Colombo, Sri Lanka.

Jt. Editor

Dr. Bhabesh Majumder
(bhabesh70@rediffmail.com)

Shubhaiyu Chakraborty
(shubhaiyu007@gmail.com)

Contents

সিন্ধু সভ্যতার ধর্ম-সংস্কৃতি এবং ভারতবর্ষে গুরুবাদের সূচনা
অভিজিৎ ব্যানার্জি 3

বাংলা নাটকে মনসামঙ্গল কাব্যের প্রয়োগ
সুনির্মল বিশ্বাস 9

শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্যে মেয়েদের কথা
রিঙ্কু রায় 21

নারী সমকামিতা ও ক্ষমতাতন্ত্র : প্রসঙ্গ দুটি বাংলা উপন্যাস
অসীম মণ্ডল 27

'দ্বিতীয় ইনিংসের পর' : বাংলা ক্রীড়াসাংবাদিকতায় মনান্তর ও খাতবদল
রাহুল পণ্ডা 32

প্রতিভা বসুর দেশভাগের উপন্যাস : দেশছাড়া বাঙালির মর্মকথা
সুখেন্দু বিশ্বাস 41

সূচনাপর্বে লেখা নাটকে (নির্বাচিত), সেলিম আল দীনের আত্মপথ অনুসন্ধান
ঈশিতা মণ্ডল 51

Sustainable Development Goals, MGNREGS and Social Audit : A Case of Rural West Bengal
Somnath Bandyopadhyay 57

Is PremKumar's Kai Varisai the Most Progressive Past ? : A Comparison of Gender Equality in Films of Two Centuries
Jayashree Premkumar Shet 81

The Space of the Other - The Body of the Dalit Woman as a Third Space in the Brahmanical Paradigm of *Ghare Baire Aj* - A Modern Political Retelling of Tagore's Classic
Medhasree Talapatra 91

OPEN EYES

সিন্ধু সভ্যতার ধর্ম-সংস্কৃতি এবং ভারতবর্ষে গুরুবাদের সূচনা

অভিজিৎ ব্যানার্জি

ভারতবর্ষে গুরুবাদের ইতিহাসের অনুসন্ধান সিন্ধু সভ্যতা থেকেই করা সম্ভব। এই অনুসন্ধানটি জটিল এবং দুরূহ। বিভিন্ন সময়ের ইতিহাসের চিহ্ন সিন্ধু সভ্যতায় রয়েছে। ফলে এই বিষয়ে একমাত্রিক সিদ্ধান্ত তৈরি করা অসম্ভব। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে সিন্ধু সভ্যতার ধর্ম-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে একাধিক স্ববিরোধী মতামত পাওয়া যাবে। এর মূল কারণ সিন্ধু সভ্যতার লিপির সর্বজনগ্রাহ্য পাঠ তৈরি এখনও সম্ভব হয়নি। ফলত প্রত্যেক ঐতিহাসিক মূলত কিছু অনুমানের সাহায্য নিয়েছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই মতান্তরের সূচনা হয়েছে ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে। বারংবার হরপ্পা অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত উপাদানগুলিকে হিন্দু ধর্মের পূর্বসূত্র হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।[১] এছাড়াও সিন্ধু সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মূর্তির সঙ্গে পরবর্তী সময়ের পৌরাণিক দেবতার সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে—যে সমস্ত প্রমাণ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়। সর্বোপরি সিন্ধু সভ্যতা এবং বৈদিক সভ্যতার সম্পর্ক দীর্ঘদিন অবধি বিশেষভাবে ভুল পড়া হয়েছে। বর্তমানে ঐতিহাসিকরা সিন্ধু সভ্যতার বিলোপ এবং আর্যদের হাতে সিন্ধু সভ্যতার বিনষ্টির বয়ান পরিত্যাগ করেছেন। এ কারণে আমরা ঐতিহাসিক ভাবে সমস্যাজনক হলেও সিন্ধু সংস্কৃতির থেকেই গুরুবার ইতিহাস খোঁজার চেষ্টা করব। কথা আলোচনা করব।

সিন্ধু সভ্যতা এবং বৈদিক সভ্যতা ঐতিহাসিকভাবে সহাবস্থান করেছিল, ফলত বৈদিক সংস্কৃতিতে সিন্ধু সভ্যতার প্রভাব থাকা অবশ্যম্ভাবী। কার্বন-নির্ণীত সময়সূচি অনুযায়ী সিন্ধুনদের উপত্যকায় আনুমানিক ৩২০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে তিনটি পৃথক সংস্কৃতির অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়।[২] প্রথমত, পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও উত্তর সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে স্পর্শ করে সর্ববৃহৎ কোট-দিজি সংস্কৃতি, দ্বিতীয়ত ভারতের পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তর-রাজস্থান লোকালয়ে অবস্থিত সোথি সিসওয়াল সংস্কৃতি এবং তৃতীয়ত বালুচিস্তান এবং মধ্য ও দক্ষিণ-বঙ্গে আবিষ্কৃত এবং গুজরাতের কিয়দংশে বিস্তৃত আম্রি-নাল সংস্কৃতি।

উক্ত সংস্কৃতির পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে মৃৎশিল্পের বিভিন্নতা থেকে। তবে এদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্য দেখা গেছে। এই সময়ের ধর্ম-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে আলোচনার মূল ভিত্তি হল প্রাপ্ত মূর্তি এবং সিলগুলিতে উৎকীর্ণ বিভিন্ন প্রতিরূপ। এদের মধ্যে কয়েকটি প্রতিনিধি স্থানীয় পুরাকীর্তির কথা বলা যেতে পারে। মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত একটি সিলে তিন মাথাওয়ালা সমাসীন দেবমূর্তিকে ঘিরে রয়েছে গণ্ডার, জলহস্তি, বাঘ এবং হাতি। এই মূর্তিকে প্রত্ন-শিব বলে মনে করা হলেও একে পশুপতি মনে করার কোন প্রত্যক্ষ কারণ দেখা যায় না।[৩] কালিবঙ্গান থেকে প্রাপ্ত একটি সিলে বাঘের মত শরীর এবং মাথায় মহিষের শৃঙ্গযুক্ত একটি দেবীমূর্তি পাওয়া যাচ্ছে যিনি যুদ্ধরত দুইজন সৈনিককে আলাদা করে রেখেছেন।[৪] এছাড়া অজস্র ক্ষুদ্রাকৃতির মাতৃমূর্তি পাওয়া যাচ্ছে যাঁদের পূজা করা হত সন্তানের আকাঙ্ক্ষায়।[৫] এরপর উল্লেখ করা যায় শ্মশ্রুসমন্বিত ও কুণ্ডলীকৃত কেশযুক্ত একটি নগ্ন পুরুষমূর্তির। পা ঈষৎ ফাঁক এবং হাত দেহের সমান্তরালে রাখা। এই ভঙ্গিটি অনেকটা জৈনদের কায়োৎসর্গের মতন।[৬] সিন্ধু সভ্যতার অজস্র সিলে আমরা অশ্বত্থ গাছের ডাল, পাতার ছবি পাচ্ছি। অনুমান করা হয় অশ্বত্থ গাছ এই সভ্যতায় মঙ্গলজনক চিহ্ন হিসাবে গ্রাহ্য হত। এছাড়াও কিছু প্রত্ন উপাদানকে অনেকেই লিঙ্গ এবং যোনি উপাসনার পূর্বচিহ্ন হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। তবে এই বিষয়ে কোনও সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এই সকল প্রত্ন উপাদানের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত একটি মূর্তি যাকে পুরোহিত-রাজার মূর্তি বলে অনেকেই চিনতে

ব্যানার্জি, অভিজিৎ : সিন্ধু সভ্যতার ধর্ম-সংস্কৃতি এবং ভারতবর্ষে গুরুবাদের সূচনা
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 2, Dec 2021, Page : 3-8, ISSN 2249-4332

চেয়েছেন। এই মূর্তির পোশাকটি বিশেষভাবে চেনা যাচ্ছে, গবেষকরা মনে করছেন এটি তারকা খচিত বস্ত্র। মূর্তির দাড়ির ধরনটির সঙ্গে মেসোপটেমিয়া অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত পুরোহিত মূর্তির প্রভাব রয়েছে বলে মনে করা হয়। এই মূর্তিটি আমাদের আলোচনায় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সিন্ধু সভ্যতায় আদৌ কোনও স্থাপত্যকে মন্দির বলে মনে করা যাবে কিনা এই বিষয়ে একাধিক মত পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকজন মনে করছেন এমন কোনও স্থাপত্য নেই যাকে ধর্মীয় স্থাপত্য বলে মনে করা যেতে পারে।[৭] আবার মহেঞ্জোদারো-র দুর্গ এবং নিমু শহরে একাধিক মন্দির পাচ্ছি যাদের সম্ভবত প্রত্ন-শিবের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছিল।[৮] এছাড়া সাতজন পুরুষ সারিবদ্ধভাবে একটি অশ্বত্থ গাছের উপাসনা করছে এমন একটি ছবি পাওয়া যাচ্ছে। এদেরকে তুলনা করা হয়েছে সপ্তর্ষির সঙ্গে।[৯] প্রসঙ্গত বলা দরকার বাঘের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধরত একটি ছবি পাওয়া যাচ্ছে যাকে *গিলগামেশ* মহাকাব্যের সঙ্গে যুক্ত করে অনেকে দেখতে চান।[১০] প্রকৃতপক্ষে *গিলগামেশ* মহাকাব্যে আমরা সপ্তর্ষির কথা পাব। বলা হয়েছে দেবী ইশ্‌তা, যিনি একই সঙ্গে ভালোবাসা এবং যুদ্ধের দেবী, তার মন্দিরের ভিত গেঁথেছিলেন সপ্তর্ষিগণ।[১১] তবে সুমের সভ্যতা প্রসঙ্গে বলা দরকার প্রাচীন বিশ্বাস অনুযায়ী জনগণ সরাসরি দেবতার সঙ্গে কথা বলতে পারেন এমনটাই পাওয়া যাবে *গিলগামেশ* মহাকাব্যের প্রথম অধ্যায় 'এনকিপুর আগমন'-এ।[১২]

সুতরাং প্রাচীন সুমের সংস্কৃতিতে সপ্তর্ষির আশ্চর্য মাহাত্ম্যের কথা থাকলেও দেবতা এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতার জন্য পুরোহিতের অবশ্যম্ভাবী অবস্থান প্রতিষ্ঠা পায়নি। তবে মনে রাখতে হবে পুরোহিত-রাজার মূর্তি বলে যে প্রত্ন-উপাদানকে চিনতে চাওয়া হয়েছে তার ভিত্তি কিন্তু তুলনামূলক সংস্কৃতির উপরই মূলত নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে কোনও পাথুরে প্রমাণ সরাসরি পাওয়া সম্ভব নয়। তবে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতা যেমন মেসোপটেমিয়া সভ্যতা, ট্রান্সকাসপিয়া, এশিয়া মাইনর, মিশরীয় সভ্যতার বেশ কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে। যেমন উক্ত প্রত্যেকটি সভ্যতাতেই মাতৃমূর্তির প্রতিকল্পরূপে উঠে এসেছে যোনি অথবা গর্ভবতী মহিলার প্রতিরূপ। এক্ষেত্রে মানবজাতির মনে একটি সাধারণ চিত্র ফুটে উঠেছে বলে মনে করা হয়।[১৩] হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত একাধিক সিলে আমরা পশু সম্বলিত দেবমূর্তি পাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে পশু সম্বলিত অধিকাংশ মূর্তিগুলিই পুরুষদেবতার মূর্তি। এই সিলগুলিতে পুরুষ মূর্তির সঙ্গে পশুদের সহাবস্থান কেবল সিন্ধু সভ্যতায় নয় সমসময়ে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাতেও দেখতে পাওয়া যাবে। উক্ত সহাবস্থানটি মাতৃকেন্দ্রিক সভ্যতার থেকে পিতৃকেন্দ্রিক সভ্যতার দিকে সরণকে বুঝতে সাহায্য করে।[১৪] পশুপালন এবং পশুশিকার কেন্দ্রিক সভ্যতায় পুরুষের আধিপত্য নারীর থেকে অধিক। সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত বৃষের প্রতিরূপ বিশেষভাবেই পুরুষের আধিপত্যকে প্রমাণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতাতেও বৃষ এবং সিংহ বিশেষভাবে পৌরুষের পরিচয় বহন করত। এমনকি গ্রিক দেবতা জিউসের পুত্র অসিরিস বৃষের মাথাযুক্ত ছিলেন।[১৫] পরবর্তী সময়ে ইন্দ্রকে বৈদিক সাহিত্যে বারংবার বৃষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রুদ্রকে তুলনা করা হয়েছে বৃষের সঙ্গে। *আবেস্তা*-য় আমরা বৃষের কথা পাচ্ছি আবেস্তীয় ইন্দ্রের অবতাররূপে।[১৬] সুতরাং সিন্ধু সভ্যতায় আদিম মাতৃদেবতার রূপকল্প থাকলেও এই সভ্যতাতেই পুরুষকেন্দ্রিক সভ্যতার দিকে যাত্রা শুরু হয়। সিন্ধু সভ্যতায় আমরা এমন কোন পুরাকীর্তি পাচ্ছি না যাকে নারী-পুরোহিত হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। অথচ মাতৃকেন্দ্রিক সভ্যতার বিভিন্ন আর্কেটাইপের বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ঔষধ এবং বিষের সঙ্গে মূলত নারী-পুরোহিতেরাই যুক্ত ছিলেন।[১৭] অধিকাংশ সময়েই দেখা যাচ্ছে আরাধ্য দেবীর পাশে তার নারী-পুরোহিত একই রকম দেহভঙ্গি নিয়ে অবস্থান করছে। সিন্ধু সভ্যতা থেকে আমরা নারী-পুরোহিতের কোন উল্লেখ পাচ্ছি না।[১৮] তবে মিশরের প্রাচীন সভ্যতায় নারী-পুরোহিতদের অবস্থানই মাতৃদেবতার পাশে দেখা যায়, পুরুষ পুরোহিতের অবস্থান বিশেষ দেখা যায় না। পুরোহিত-রাজার যে মূর্তিটির কথা আমরা বলছিলাম প্রায় একই ধরনের বসা এবং দাঁড়ানো কিছু মূর্তি, যাদের মধ্যে দেহভঙ্গির আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে এমন কিছু মূর্তি পৃথিবীর অন্য কয়েকটি সভ্যতাতেও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।[১৯]

প্রকৃতপক্ষে সিন্ধু সভ্যতার বেশ কিছু সিল মেসোপটেমিয়া এবং ইরাকে পাওয়া গেছে, যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে এইসব অঞ্চলের সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। একারণেই মেসোপটেমিয়া তথা পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন অঞ্চলের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে সিন্ধু-সভ্যতার ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভব হয়েছে। কেবল ধর্ম-সংস্কৃতি নয় সিন্ধু সভ্যতায় কৃষিকার্য সম্পর্কে অনুমান করার জন্যও ঐতিহাসিকেরা মিশর এবং মেসোপটেমিয়া সভ্যতার তুলনা উপস্থিত করে থাকেন।[২০] সিন্ধু সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত যে মূর্তিটিকে পুরোহিত-রাজার মূর্তি মনে করা হয়েছে তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মূর্তির পরণে ত্রিপত্র খচিত বস্ত্রটি। প্রকৃতপক্ষে পুরোহিতদের মধ্যে এক বিশেষ প্রকার ‘গাউন’ করার চল পৃথিবীর নানা দেশে দেখা যাচ্ছে। সিন্ধু সভ্যতায় একই ধরনের মূর্তি নানা এলাকায় পাওয়া যায়। ত্রিপত্র চিহ্নের ব্যবহারও হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোতে বহুল প্রচলিত। অধিকাংশ সময়ে দেখা যাচ্ছে মূর্তিগুলি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তৈরি করা হয়েছে। পাকিস্তানের জাতীয় যাদুঘরের ৫২.১৮৬০ ক্রমাঙ্কের মূর্তিটি দেখে অনুমান করা যাচ্ছে শিল্পীরা খুবই যত্নের সঙ্গে মূর্তিটি তৈরি করেছেন। প্রায় সকল ক্ষেত্রে ত্রিপত্র চিহ্ন তৈরি করার সময় লাল রঙের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। প্রায় একই রকমের ত্রিপত্র চিহ্নের ব্যবহার আমরা মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় খ্রিস্ট পূর্ব ২১০০-২০০০ অব্দের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।[২১] অধিকাংশ মূর্তিতে একজন দাড়িযুক্ত পুরুষের মাথা এবং দেহটি ষাঁড়ের এবং গায়ে ত্রিপত্র চিহ্ন খচিত বস্ত্র। একই ধরনের বস্ত্রের ব্যবহার আমরা মিশরের প্রাচীন সভ্যতায় পাচ্ছি। সেখানে রাজা এবং দেবতার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে একজন পুরোহিতের কথা পাওয়া যাচ্ছে। পরবর্তী সময়ে মধ্যস্থতাকারী পুরোহিত নিজেই আরাধ্য দেবতায় পরিণত হয়েছেন। গবেষকরা দেখিয়েছেন সুমের-এ ত্রিপত্র চিহ্নটি প্রকৃতপক্ষে ‘তারা’র চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হত। সুতরাং ত্রিপত্র চিহ্নটির একটি জ্যোতিষিক গুরুত্ব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তবে ত্রিপত্র চিহ্নটি পশ্চিম এশিয়া এবং মিশরে মাতৃদেবতা আরাধনায় ব্যবহৃত হত। মেসোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত ত্রিপত্র অথবা তারকাখচিত বস্ত্র পরিহিত মূর্তিগুলির বিশেষ অর্থ রয়েছে। মেসোপটেমিয়ায় প্রত্যেকটি চিহ্নের আলাদা ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। মূলত মেসোপটেমিয়ার মন্দিরগুলিতে একভাবে বিশ্বের ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়। যেমন মন্দিরটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ, মূর্তিগুলি ব্রহ্মাণ্ডের নানা সৃষ্টির প্রতিরূপ। পুরোহিতের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে দেবতার পোশাক, তার বাহন, মাথার চুলের ধরন অনুযায়ী আলাদা আলাদা পুরোহিতের মূর্তি তৈরি করা হয়েছে দেবতাভেদে।[২২] এর ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা হচ্ছে পুরোহিতের মধ্য দিয়ে আসলে দেবতার শক্তির একটি প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। বস্ত্রের মাধ্যমেই শিল্পীরা সাধারণ মূর্তির থেকে দেবতা এবং পুরোহিত তথা রাজার পার্থক্য বুঝিয়ে দিতেন। এক্ষেত্রে একটি মিথের কথা বলা যেতে পারে। পরিধেয় বস্ত্র যে প্রকৃতপক্ষে দৈবীশক্তিরই প্রকাশ এমন বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে মেসোপটেমিয়ায় দেবী ইনান্নার একটি আখ্যানে, যেখানে দেবী তাঁর দিব্য পোশাক একে একে ত্যাগ করে মর্ত্যে প্রবেশ করছেন। এই আখ্যানে দেবীকে বারংবার সাবধান করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি বারণ না শুনে বস্ত্রত্যাগ করেন এবং তাঁর দৈবীশক্তি লোপ পায়।[২৩] অতএব বস্ত্রের সঙ্গে দৈবী শক্তির যোগাযোগ মেসোপটেমিয়ার আখ্যানে স্পষ্ট। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে নব্য-ব্যবিলনীয় সভ্যতার বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে আমরা রাজা এবং দেবতাদের দিব্যবস্ত্রের প্রসঙ্গ পাচ্ছি। মেসোপটেমিয়া সভ্যতার এই প্রভাব হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত মূর্তিতে এসেছে না কি উল্টোটা তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে কিছু বিতর্ক থাকলেও হরপ্পা তথা সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত মূর্তিটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিশেষ মতান্তর দেখা যাচ্ছে না। সকলেই মনে করছেন এই মূর্তিটির একটি ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে এবং মূর্তিটি দেবতার মূর্তি নয়, মানুষের মূর্তি। প্রসঙ্গত আরও বলা যেতে পারে জরাথুস্ট ধর্মাবলম্বীদের আরাধ্য অহুর মাজদার কল্পনাতেও আমরা এই ধরনের বস্ত্রের কথা পাব। একই ভাবে পাওয়া যাবে বৈদিক দেবতা বরুণের ক্ষেত্রেও।[২৪]

মোট কথা সিন্ধু-সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত পুরোহিত-রাজার মূর্তি থেকে আমরা কয়েকটি প্রবণতাকে চেনার চেষ্টা করতে পারি যা ভারতবর্ষে গুরুবাদের প্রাক্-ইতিহাস বুঝতে সাহায্য করে—

১) সিন্ধু সভ্যতায় আমরা দেবতার পাশাপাশি পুরোহিত-রাজার মূর্তি পাচ্ছি যাঁর বস্ত্র থেকে অনুমান করা হচ্ছে তিনিও কিছুদূর অবধি দৈবী শক্তির অধিকারী।

২) ঐতিহাসিকেরা মূর্তিটিকে পুরোহিত-রাজার মূর্তি বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এখন যেহেতু সিন্ধু সভ্যতার লিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এবং আমরা অন্য কোনও সাহিত্যিক উপাদান পাইনি, তাই এই সিদ্ধান্তে আসা সত্যিই মুশকিল যে মূর্তিটি কেবল ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের না কি সেই ব্যক্তি একই সঙ্গে রাজনৈতিক অর্থাৎ প্রশাসনিক ক্ষমতারও অধিকারী ছিলেন? মেসোপটেমিয়া সভ্যতার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রাজাদের সরাসরি যোগদানের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা সিন্ধু সভ্যতায় ছিল কি না তা বলা সম্ভব নয়।

৩) মেসোপটেমিয়া ক্ষেত্রে সাহিত্যিক উদাহরণ থেকে আমরা নিশ্চিত যে তারকাখচিত বস্ত্র আসলে দৈবী ক্ষমতার প্রকাশক। সুতরাং, সিন্ধু সভ্যতায় এই বিশ্বাসটি ছিল যে দৈবী শক্তি এবং সাধারণ মানুষের মাঝামাঝি এমন একদল মানুষ আছেন যাঁরা এই দুটি স্তরের মধ্যস্থতা করতে পারেন।

৪) মধ্যস্থতা করার জন্য এই পুরোহিতদের পৃথক সামাজিক মর্যাদা ছিল, সিন্ধু সভ্যতায় অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তৈরী করা মূর্তিগুলি আমাদের সেই প্রমাণ দিচ্ছে। তবে সিন্ধু সভ্যতায় এই মধ্যস্থতা ঠিক কীভাবে করা হত তা বোঝা সম্ভব নয়।

সিন্ধু সভ্যতার বিনষ্টি এবং ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত একটি ধারণা আমাদের মধ্যে রয়েছে। মোটের ওপর আর্য আক্রমণকে সিন্ধু সভ্যতার পতনের কারণ বলে মনে করা হত। পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে আর্য আক্রমণ সিন্ধু সভ্যতার বিনষ্টির মূল কারণ-ই নয়। বৈদিক সাহিত্য থেকে এমন কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যা থেকে প্রমাণিত হয় আর্য সভ্যতা এবং সিন্ধু সভ্যতা পরস্পরের সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় সহাবস্থান করেছিল। আর্য সভ্যতার আক্রমণে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার তত্ত্ব মেনে নিলে আমরা আর্য এবং তৎপরবর্তী ভারতবর্ষীয় ধর্মভাবনায় সিন্ধু সভ্যতার গুরুত্বকেই আসলে অস্বীকার করে ফেলব। প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে আর্যদের প্রথমে আশ্রয় দিয়েছিলেন স্থানীয় শাসকেরা। অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতার মানুষজন। এই দেশে থেকেই তাঁরা ধর্মাচরণ করতেন, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করতেন।[২৫] সিন্ধু সভ্যতার কিছু পুরাতাত্ত্বিক উপাদানে যজ্ঞরত মানুষের চিত্রার্ধ পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে বৈদিক মন্ত্রে অগ্নির কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে তিনি যেন নগর এবং দুর্গকে রক্ষা করেন।[২৬] প্রকৃতপক্ষে বৈদিক সভ্যতা কখনোই নগরকেন্দ্রিক ছিল না, তা সত্ত্বেও বৈদিক ঋষিদের এই প্রার্থনা সিন্ধু এবং বৈদিক সভ্যতার সহাবস্থানেই প্রমাণ। বাইরে থেকে আগত আর্যদের মূলত দুটি জীবিকার কথা পাওয়া যাচ্ছে—পুরোহিত এবং যোদ্ধা। ঋগ্বেদ-এর নবম মণ্ডলের ১১২ সংখ্যক মন্ত্রে আর্যদের নানা পেশার কথা বলা হলেও বাণিজ্যের কথা বলা হয়নি।[২৭] অন্যদিকে ঋগ্বেদে ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দাদের 'পণি' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যাস্কের 'নিরুক্ত' মতে পণি-রা হলেন বণিক। সায়ণাচার্য বলছেন 'পণি' শব্দটি 'পণ' থেকে এসেছে যার অর্থ মূল্য অথবা দান। তবে যাস্ক-ই তাঁর 'নিরুক্ত'-এ পণিদের দৈত্য বলেছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে পণিদের নিয়ে দুটি মন্ত্র পাওয়া যাচ্ছে। একটিতে বলা হল পণিরা যজ্ঞ সম্পাদন করেন না, অন্যটিতে বলা হল পণিরা যেহেতু যজ্ঞ করেন না, তাই এদের প্রাণ নষ্ট হোক।[২৮]

সুতরাং সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার সম্পর্কে সংঘর্ষ এবং সহাবস্থান দুটি দিকই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তবে বৈদিক সাহিত্যের বর্ণনা থেকে এবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব যে সিন্ধু সভ্যতায় পুরোহিত-রাজাদের ধর্মাচরণে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান এবং আহুতি দানের কোনও প্রসঙ্গ ছিল না। উপরন্তু সিন্ধু সভ্যতায় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আর্যদের থেকে এতটাই পৃথক ছিল আর্যরা অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করতেন। প্রসঙ্গত আরেকটি দিকের কথা প্রসঙ্গে বর্তমান আলোচনা শেষ করব। সিন্ধু সভ্যতায় আমরা যেকটি পুরোহিত-রাজার মূর্তি পেয়েছি তার সবকটি পুরুষমূর্তি। যদিও আমরা আগেই দেখেছি সিন্ধু সভ্যতায় মাতৃ সাধনার প্রচলন খুব সম্ভবত ছিল না। যদিও সাধনার ঝোঁকে একটি

পরিবর্তনও দেখা যাচ্ছিল। তবে মেসোপটেমিয়ায় কিন্তু পুরুষ পুরোহিতের পাশাপাশি আমরা মহিলা পুরোহিতেরও মূর্তি পেয়েছি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছিলাম মাতৃ উপাসনায় একটি সময়ে মহিলা পুরোহিতের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। এঁরা মূলত ঔষধ এবং বিষ প্রসঙ্গে পটু ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভূমধ্যসাগর থেকে গঙ্গা মধ্যবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত প্রজননের শক্তিরূপে মাতৃদেবতার আরাধনা, মাতৃমূর্তির নির্মাণ এসবই ক্যালপেলেথিক পর্বে সূচিত হয়, এবং এর উৎস সম্ভবত এক সূত্রেই গাঁথা। মিশরে, মেসোপটেমিয়ায় এই সময়ের মাতৃকেন্দ্রিক সভ্যতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। একই ভাবে পৃথিবীর যে কোনও নগর সভ্যতার সূচনা প্রাচীনকালে মাতৃপ্রধান সমাজের হাত ধরে হয়েছিল বলেই মনে করার কারণ আছে।[২৯] ভারতবর্ষের ইতিহাসে মাতৃকেন্দ্রিক সভ্যতার আদিম বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় সাবিত্রী-সত্যবানের আখ্যানে যা সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হলেও প্রাচীন মাতৃকেন্দ্রিক সমাজের ছাপ কিছুদূর অবধি বহন করে চলেছে।[৩০] তবে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো তথা সিন্ধু সভ্যতা মাতৃকেন্দ্রিক সভ্যতার চিহ্ন বহন করলেও সেই সময়ে পুরুষকেন্দ্রিক নগর জীবন শুরু হয়ে গিয়েছিল।[৩১] সুতরাং ধর্মীয় ইতিহাসের দিক থেকে ভারতবর্ষে দেবলোক এবং মানবলোকের মধ্যস্থতায় প্রথম থেকেই পুরুষের প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে। অতএব পুরুষের হাত ধরেই যেমন প্রাচীন ভারতের সামাজিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের বদল ঘটেছে একই ভাবে ধর্মীয় জীবনেও পুরুষ পুরোহিতের সূত্রই ক্ষমতা ও রাষ্ট্রের নীতির মাধ্যমে ধর্মবিশ্বাসকে প্রভাবিত করেছে।

তথ্যসূত্র

১. Piggot, Stuart, *Prehistoric India*, Harmonds Worth : Penguin Books, 1950, 3rd Reprint, P. 203.
২. হাবিব, ইরফান, সিন্ধু সভ্যতা, কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০০৯, চতুর্থ মুদ্রণ, পৃ. ১০।
৩. তদেব, পৃ. ৫৯।
৪. তদেব, পৃ. ৫৯।
৫. তদেব, পৃ. ৬০।
৬. বাসাম, এ. এল. অতীতের উজ্জ্বল ভারত, কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১১, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ. ৩০।
৭. Macky, Earnest, *Early Indus Civilizations*, London : Luzac & Company, 1948, 1st Edition, P. 52.
৮. Alchin, Raymond & Bridget, *The Rise of Civilization in India and Pakistan*, New Delhi : Cambridge University Press, 2013, 6th Reprint, P. 213.
৯. তদেব, পৃ. ২১৪।
১০. তদেব, পৃ. ২১৫।
১১. মোহাম্মদ, জামান, গিলগামেশ কাব্য, ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০১৬, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ১৪।
১২. তদেব, পৃ. ১৫।
১৩. Naumann, Erich, *The Greatest Mother An Analysis of the Archetype*, Prenceton : Princeton University Press, 1983, Second Edition, P. 3.
১৪. Sen, Asis, *Animal Motifs in Ancient Indian Art*, Calcutta : Firma KLM, 1972, 1st Edition, P. 55-66.
১৫. তদেব, পৃ. ৫৭।
১৬. তদেব, পৃ. ৬০।
১৭. Neuman, Erich, Ibid, P. 60.
১৮. তদেব, পৃ. ১১৭।

১৯. Gordon, D.H., *The Pre-Historic Background of Indian Culture*, Bombay : N.M. Tripathi Private Limited, 1958, First Edition, P. 69.

২০. তদেব, পৃ. ৬১।

২১. Parpla, Asko, *The Sky-Garment A Study of the Harappan Religion and its Relation to the Mesopotamia and Later Indian Religions*, Helsinki : The Finish Oriental Society, 1985, 1st Edition, P. 27.

২২. তদেব, পৃ. ২৯।

২৩. তদেব, পৃ. ৩০।

২৩. তদেব, পৃ. ৩৭।

২৫. Chanda, Ramaprasad, 'Survival of Prehistoric Civilization of the Indus Valley', Lahiri Nayanjit Edited, *The Decline and Fall of the Indus Civilization*, Delhi : Permanent Black, 2000, 1st Edition, P. 04.

২৬. Chanda, Ramaprasad, *The Indus Valley in the Vedic Period*, Calcutta : Government of India Central Publication Branches, 1926, 1st Edition, P. 04.

২৭. তদেব, পৃ. ০৫।

২৮. তদেব, পৃ. ০৫।

২৯. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *মাতৃতান্ত্রিক সমাজ সে-যুগে মায়েরা বড়ো*, ঢাকা : নালন্দা, ২০০৯, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১৫।

৩০. চৌধুরী, সুজিৎ, *প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য : কিংবদন্তীর পুনর্বিচার*, কলকাতা : প্যাপিরাস, ২০১৬, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪০।

৩১. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *মাতৃতান্ত্রিক সমাজ সে-যুগে মায়েরা বড়ো*, ঢাকা : নালন্দা, ২০০৯, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৫৪।

অভিজিৎ ব্যানার্জি
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা নাটকে মনসামঙ্গল কাব্যের প্রয়োগ

সুনির্মল বিশ্বাস

গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। চেনা জানা গল্পের মাধ্যমে খুব সহজেই বক্তব্য বিষয়কে প্রকাশ করা যায়। মঙ্গল কাব্যের কাহিনি, চরিত্র আমাদের অতি পরিচিত। মনসামঙ্গল হল মঙ্গলকাব্যধারার সবচেয়ে জনপ্রিয় কাব্য। 'মনসামঙ্গল কাব্য' বলতে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে মনসার প্রকোপে চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যু, কালিদহে মধুকর ডিঙা ডুবে যাওয়া, বাসরঘরে লখিন্দরের সর্পাঘাত, মৃত স্বামীকে বাঁচাতে ভেলায় চেপে বেহুলার স্বর্গযাত্রার মতো ঘটনাক্রম। চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্ব, বেহুলার আত্মত্যাগের কাহিনি গ্রামের শ্রোতারা আজও ভক্তিভরে শোনে। শুনতে শুনতে মনের অজান্তে কাব্যের চরিত্ররাও তাদের কাছের মানুষ হয়ে গেছে। এই সব চরিত্রের মাধ্যমে অনায়াসে সমকালীন বাস্তবতার রূপটি ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে। যা মানুষকে অনেক বেশি কাছে টানবে। শুধু বাংলা নয়, বাংলার বাইরেও মনসামঙ্গলের প্রচলন রয়েছে। ব্রতকথা, ব্যালাড ও মহাকাব্যের ত্রিধারা মনসামঙ্গলকাব্যকে অন্যান্য মঙ্গলকাব্য থেকে স্বতন্ত্র করেছে।

বাঙালির নাট্য ইতিহাস খুবই প্রাচীন। বাংলা সাহিত্যের আদিগ্রন্থ চর্যাপদের ১৭ সংখ্যক পদে নাটক অভিনয়ের কথা রয়েছে—'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী। বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।'[১] মধ্যযুগে ভক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মিথিলার কীর্তনিয়া নাটক, ওড়িশার ভক্তিনাটক, আসামের অঙ্কিয়া নাটকের মত বাংলায়ও গৌড়ীয় নাটক রচনা ও অভিনয় হত। ভক্তি-প্রভাবিত নাটক ব্যতীত আরও জন-বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল। ষোড়শ শতক থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত পাঁচালী বা 'মঙ্গল'গান ছিল খুবই জনপ্রিয় বিনোদন মাধ্যম। অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু বলেছেন—

> 'মঙ্গলগীতি বা পালাগানের মধ্যে এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তরের ভিতর দিয়াই নাট্যাভিনয়ের অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল। .... এই সকল প্রাচীন মঙ্গলগীতির মধ্যে পাণ্ডিত্যের অভাব থাকুক, নাটকত্বের অভাব ছিল না।'[২]

গ্রামগঞ্জে ভক্তিমূলক যাত্রাপালা, ঝাঁপানগান, ঝুমুরগানসহ অন্যান্য লোকগানে অভিনয়ের যে ঐতিহ্য ছিল, তাকে কাজে লাগিয়ে কলকাতা শহরে নাট্যশালা গড়ে ওঠে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর অভিনয় শিল্পে বড় রকমের পরিবর্তন আসে। দর্শক রুচির কথা মাথায় রেখেই পৌরাণিক ও ধর্মীয় ভাবাবেগ সমৃদ্ধ নাটক অভিনীত হতে থাকে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের হাত ধরে পৌরাণিক নাটক উনিশ শতকীয় নাট্যচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রামায়ণ, মহাভারতের পাশাপাশি মঙ্গলকাব্যের কাহিনি নিয়েও নাটক লেখা শুরু হয়। পুরাতন কাব্যকথা অবলম্বনে নাটক রচনার রেওয়াজ এখনও সমান তালে চলছে। তবে মঙ্গলকাব্যকে আশ্রয় করে বিশুদ্ধ নাট্যরচনার সূত্রপাত উনিশ শতকে। উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে বাঙালির ধর্মচিন্তায় নবীনতা আসে। এর গোড়ায় ছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। ফলে নাটকেও নব্য ভক্তিবাদের প্রভাব পড়ল। এই সময় পৌরাণিক ভক্তিমূলক নাটকের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি বুঝেছিলেন ভারতবর্ষের মর্মে মর্মে ধর্ম। তাই মর্মকে আশ্রয় করতে হলে ধর্মের আশ্রয় নিতেই হবে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন—

> 'তিনি পৌরাণিক নাটকের ভিতর দিয়া বাংলারই পুরাণ-কথা প্রচার করিয়াছেন। বাংলাদেশের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহার দৃষ্টি হিন্দু সংস্কৃতির মৌলিক আদর্শ সন্ধান করিতে যায় নাই। সেইজন্য বাল্মীকির পরিবর্তে কৃত্তিবাস, বেদব্যাসের পরিবর্তে কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম, রামেশ্বর, ভারতচন্দ্রই তাঁহার অবলম্বন

বিশ্বাস, সুনির্মল : বাংলা নাটকে মনসামঙ্গল কাব্যের প্রয়োগ
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 2, Dec 2021, Page : 9-20, ISSN 2249-4332

> ছিল। বাংলার নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতির উপর এত সুগভীর মমতা ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই।"[৩]

গিরিশচন্দ্র মাইকেল মধুসূদন দত্ত কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত ভারতীয় পৌরাণিক চরিত্রগুলি নব ব্যাখ্যা দিতে চাননি। বাঙালির চিরপরিচিত বিষয়বস্তুর নাটকীয় রূপ দিয়েছেন মাত্র। সমসাময়িক জনসাধারণকে ভক্তিরস আস্বাদনের কর্মে ব্রতী হয়েছেন। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনির নাট্যরূপ দেওয়ার পাশাপাশি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের চরিতকাব্য, মঙ্গলকাব্য অবলম্বনে নাটক রচনা করেছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, হরনাথ বসু, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, মন্মথ রায়, যোগেশ চৌধুরী, পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্র, রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকুমার দাশ, শেখর দেবরায়, সেলিম আল দীন, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্যকারের নাট্যভাবনায় মঙ্গলকাব্য স্থান পেয়েছে। নির্বাচিত বাংলা নাটকে মনসামঙ্গলের আখ্যান-চরিত্র ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা কীভাবে মধ্যযুগের কাব্য ঐতিহ্য উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে—বর্তমান প্রবন্ধে তা আলোচনা করা হবে।

২

মনসামঙ্গল অবলম্বনে রচিত প্রথম বাংলা নাটক হল হরনাথ বসুর 'বেহুলা'। নাটকে বেহুলা ও মনসাকে অভিন্ন নারীরূপে দেখানো হয়েছে। তাঁরা দুজনেই মহাশক্তির অংশ। সতীশক্তিরূপে বেহুলার মর্ত্যে আগমন। আবার তিনিই মনসারূপে স্বর্গে বিরাজমানা। দেবতার চরিত্র সম্বন্ধে লৌকিক ভ্রান্ত ধারণা দূর করতেই নাট্যকার পুরাণের দ্বারস্থ হয়েছেন। নাটকে মনসার উপস্থিতি সেভাবে চোখে পড়ে না। তাঁর পরিবর্তে মনসাসেবিকা মণিভদ্রা নাগরানীরূপে স্থান পেয়েছে।

মনসা শিক্ষিত সমাজের কাছে অনার্য কুহকের দেবী। চম্পকবাসীরা নিজেদের সনাতনী ভেবে তাঁকে হেয় করে। মনসার পূজার জন্যই মণিভদ্রা অপহরণ করে চাঁদপুত্র লক্ষ্মীন্দ্রকে। নাগের কবল থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে চাঁদপুত্র স্বেচ্ছায় বন্দী হয়। চাঁদের সত্য-রক্ষার অদম্য লড়াই এখানেও দেখা যায়। তাই নাগেরা চাঁদের চন্দ্রনাথ মন্দির ধ্বংসের হুমকি দিলে চাঁদ নিজের পুত্র অপেক্ষা মন্দির রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছেন। চাঁদ যুক্তিবাদী কুসংস্কারমুক্ত মানুষ। সাধু বণিক লক্ষ্মীন্দ্রের কোষ্ঠীতে সর্পযোগ দেখে ভীত হলে নিজেই তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন। স্ত্রী সনকা লক্ষ্মীন্দ্রের সর্পযোগ কাটাতে মনসার পূজা করতে চাইলে চাঁদ স্বধর্মের কথা মনে করিয়ে দেন। ধর্মই তাঁর কাছে বড়। তাই তিনি বলেন—

> 'কে নখিন! সে আমার সন্তান বটে—কিন্তু আমার ধর্ম্মের চেয়ে বড় নয়! যদি সেই ঘৃণিতা, দেবীনামের কলঙ্ক, সর্ব্বনাশী, শয়তানীর পূজা না কল্লে আমার অমঙ্গল ঘটে তবে আমার সন্তানে কাজ নেই।"[৪]

চাঁদ সাধুকে কথা দিয়েছেন। কথার নড়চড় হবার উপায় নেই। মণিভদ্রার লক্ষ্মীন্দ্রকে বিবাহের প্রস্তাবকে বিদ্রূপ করেন চাঁদ। অনার্য নাগকন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ তাঁর চিন্তার অতীত। কোন প্রকারে সে মনসার পূজা করবে না। বন্ধু শঙ্করের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। শতপুত্রের বিনিময়ে চাঁদ নিজের বিশ্বাস, নীতি বিসর্জন দিতে নারাজ। মণিভদ্রা চাঁদের এই বিশ্বাসটুকু পেতে চায়। মহাজ্ঞান হারানোর দিনেই চাঁদ লক্ষ্মীন্দ্রকে হারান।

নাট্যকার নাট্যকাহিনিতে লক্ষ্মীন্দ্র, বেহুলা ও মণিভদ্রার ত্রিকোণ প্রেম দেখিয়েছেন। বাল্যকাল থেকে বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দ্রের প্রেম। মণিভদ্রা লক্ষ্মীন্দ্র ভালবাসে। কিন্তু লক্ষ্মীন্দ্র ভালবাসে বেহুলাকে। বঞ্চিতা মণিভদ্রা তাঁদের মিলন দেখে সুখ পেতে চায়। লক্ষ্মীন্দ্র তাঁর প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। নাটকে মণিভদ্রার নারীত্বের অপূর্ব স্ফূরণ ঘটেছে। নারী মনস্তত্ত্বের দিকটিকে নাট্যকার গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই গুরু আস্তিকের উদ্দেশ্যে মণিভদ্রাকে বলতে শোনা যায়—

> 'তুমি গৈরিকাশ্রয়ী পুরুষ! তুমি রমণীর হৃদয় জান না। তা জানবার ক্ষমতাও তোমার নেই; তুমি তা বুঝতে পারবে না। তুমি জান না শিক্ষা এক, ভালবাসা আর; .... তুমি জান না রমণীর অস্তিত্ব প্রতিভায় নয়, রমণীর জীবন কেবল প্রণয়ে।"[৫]

বেহুলা নিজের স্বামীকে বাঁচাতে তৎপর। মণিভদ্রার ডেরা থেকে লক্ষ্মীন্দ্রকে উদ্ধার করে। চন্দ্রধর লোকমুখে শোনে দেবীর স্পর্শে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে। বেহুলার শক্তিতে লক্ষ্মীন্দ্র পুনর্জীবন পায়, চাঁদও শেষে সতীলীলা বুঝতে পারেন। উনিশ শতকে বাংলায় নারীর স্বাধিকার অর্জনের যে লড়াই শুরু হয়েছিল, নাট্যকার হরনাথ বসু নাটকে বেহুলা ও মণিভদ্রার মধ্য দিয়ে সেই বার্তাই দিয়েছেন।

৩

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার হলেন মন্মথ রায়। ঐতিহাসিক, একাঙ্ক নাটকের পাশাপাশি একাধিক জনপ্রিয় পৌরাণিক নাটক লিখেছেন। তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলিতে ভক্তিভাবুকতার সঙ্গে স্বদেশপ্রেম, স্বজাত্যবোধ ফুটে উঠেছে। জনরুচির কথা মাথায় রেখেই ১৯২৭ সালে তিনি বাংলার জনপ্রিয় লোকপুরাণ মনসামঙ্গলের কাহিনি অবলম্বনে লেখেন তিন অঙ্কের নাটক 'চাঁদ সদাগর'।

মনসা সঙ্গে শৈব চাঁদের চিরাচরিত বিরোধের প্রেক্ষাপটে নাটক রচিত হয়েছে। চম্পকনগরীতে চাঁদ মনসার পূজা করছে সেই সংবাদ শোনার জন্য পুত্র আস্তিকের জন্য অপেক্ষারত। কিন্তু পুত্র মুখে শোনে চাঁদ ঘটা করে তাঁকে নয়, শিবদুর্গার পূজা করছে। চাঁদ নিজের রাজ্যে মনসা পূজা নিষেধ করেছে। তরুণীর ছদ্মবেশে মনসা চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করে। চাঁদ মনে করে মনসার পূজা করার অর্থ অপদেবতার পূজা করা। তাই নিজের মহাজ্ঞান হারিয়েও হুঙ্কার ছাড়তে তিনি ভোলেননি—

> 'শোন কানী! স্বর্গের শিবশম্ভু আর মর্ত্যের ধন্বন্তরী আমার জাগ্রত রক্ষা কবচ। দেবতা যার সহায়, সে অপদেবতাকে ভয় করে না।"[৬]

চাঁদ বন্ধু ধন্বন্তরিকে মনসার প্রকোপ থেকে বাঁচাতে পারেন না। ছয়পুত্র তাঁর কাছে তুচ্ছ। মনসার সঙ্গে লড়তে গেলে ধন্বন্তরিকে বাঁচাতেই হবে। ছয় পুত্রের বিনিময়েও চাঁদ অপদেবতার পূজা করবেন না। তাই স্ত্রী সনকার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন—

> 'চাই না রানী তাদের পুনর্জীবন! তারা ছিল আমার বন্ধন .... আমার মোহ .... আমার মায়া! সে বন্ধন খসে গেছে, মায়া কেটে গেছে, মোহ ভেঙে গেছে! আনন্দ কর! .... উৎসব কর!"[৭]

চাঁদের এই শোকের মধ্যে রয়েছে গৌরব। দেবী চণ্ডীর কাছে নিজের মৃত্যু কামনা করে। ছয় পুত্রবধূর অকাল বৈধব্য সে মানতে পারেন না। স্ত্রী বাড়িতে মনসার ঘট স্থাপন করলে দুঃখে গৃহত্যাগ করতে চেয়েছেন। কারণ তাঁর আরাধ্য দেবতা যে দেবাদিদেব মহাদেব।

চাঁদ ছাড়া মনসার পূজা পাওয়া সম্ভব নয়। কালিদহে চাঁদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিয়ে অনুতপ্ত মনসা। চাঁদের নিষ্ঠা একাগ্রতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর পূজা পাওয়ার ইচ্ছা বেড়ে যায়। শিবের প্রতি চাঁদের অটল বিশ্বাস। বেহুলার নৃত্যের বিনিময়ে লখিন্দর প্রাণ ফিরে পায়। স্ত্রী সনকা ও পুরবাসীরা মনসার জয়ধ্বনি তুললে চাঁদ একাকীত্ববোধ করে। নিজেকে বোঝায়—

> 'এ আমার পরাজয় নয়। ওরা ভীরু। ওরা কাপুরুষ। ওরা উপর্যুপরি বিপদপাতে দুর্ব্বল। তুমি তো ভীরু দেবতা নও .... কাপুরুষের দেবতা নও .... দুর্ব্বলতার আদর্শ নও। চেংমুড়ী কানী! এ তোমার জয় নয় .... এ তোমার লজ্জা।"[৮]

চাঁদের মত এক সাধারণ মানুষের ভয়ে রাজ্যের কেউই মনসা পূজায় সাহস দেখায়নি। ব্রাহ্মণবেশী শিব তাঁর অহংসর্বস্বতা ভেঙে মনসার পূজা করতে বলেন।

মন্মথ রায় যখন নাটক রচনা করেন তখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শেষ হয়েছে। দেশবাসী স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর। ইংরেজ শাসনের জাল ছিন্ন করতে নতুন আদর্শে সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। তাই নাট্যকার আদর্শবান মানুষ চরিত্র নির্মাণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। চাঁদ সওদাগর সেই আদর্শবান মানুষ। তিনি নিজের দেশকে অপদেবীর

হাত থেকে রক্ষা করার লড়াই করছেন। মনসামঙ্গলের মনসাকে যেমন অনিষ্টকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নাটকে মনসা অনেক বেশি মানবিক। চাঁদকে বিপদে ফেলে নিজেই তাঁকে বাঁচাতে গেছেন।

৪

মনসামঙ্গলের বেহুলা চরিত্রের প্রতি প্রবল আকর্ষণ থেকেই নাট্যকার পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় 'চাঁদ সদাগর (বেহুলা)' নাটকটি লিখেছেন। এপ্রসঙ্গে নাট্যকার বলেছেন—

'বঙ্গ-সাহিত্যে সতী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শ সতীদিগের পবিত্র কাহিনীতে অলঙ্কৃত; তাঁহাদের মধ্যে সকলেই ভারতীয়া বটে, কিন্তু কেহই বাংলার ঘরের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। বাংলা যাঁহাকে লইয়া গর্ব্ব করিতে পারে—তাঁহার নাম 'বেহুলা'। এই বেহুলাই আমাদের একান্ত আপনার জন্য।''[৯]

বেহুলার সংগ্রাম প্রসঙ্গে আসে চাঁদ সওদাগরের ব্যক্তিত্বের লড়াই। চাঁদের পণ—সর্পহীন পৃথিবী গড়া। সেখানে মনসা পূজা হবে না। জনৈকা রমণীর পুত্র সর্পাঘাতে মারা গেলে সবার মুখে শোনে মনসার পূজা করলে মৃত পুত্রকে ফিরে পাওয়া যাবে। কিন্তু চাঁদের রাজ্যে মনসা পূজা নিষিদ্ধ। চাঁদ নিজের মহাজ্ঞান মণির দ্বারা প্রাণ ফিরিয়ে দেন।

দেবকন্যা হয়েও মনসা দেবতার আসন পাননি—এটাই তাঁর দুঃখ। তাই সে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করে। বন্ধু ধন্বন্তরিকে সাপে কামড়ালে তার দুই সহচর ধনা ও মনা বিশল্যকরণী আনতে ব্যর্থ হয়। চাঁদের ভৃত্য নেড়ার মধ্যেও চলে মানসিক দ্বন্দ্ব। মনিবের কথা মত সে মনসাকে কুকথা বললেও মনে মনে মনসাকে ভক্তি করে। তুচ্ছ এক মানুষের কাছে নিজের পরাভব মনসা মানতে পারে না। শুধুমাত্র চাঁদের হাত থেকে পূজা পেতেই তাঁকে অপমান সহ্য করতে হয়। মনসাও বুঝতে পারে চাঁদ মরবে তবু নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবে না। মানুষের সঙ্গে দেবতার লড়াইয়ে জয়-পরাজয় দুয়েই আনন্দ। চাঁদ লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরে আসেননি। পুত্রবধূ বেহুলাকে সাহস যোগান—

'পারবি, মা? পারবি তুই আমার লখিনকে ফিরিয়ে আনতে? পারিস যদি, পদ্মার দর্প চূর্ণ হবে।''[১০]

বেহুলাও শ্বশুরকে আশ্বস্ত করে। তাঁর পুত্রকে সে ফিরিয়ে আনবেই। দেবীর কৃপায় বেহুলা নিজের স্বামী, ভাসুরদের ও শ্বশুরের সপ্তডিঙা ফিরিয়ে আনে। শতঘৃণা সহ্য করেও মনসা চাঁদের হাত থেকেই পূজা নেবার লোভ ত্যাগ করতে পারিনি। তাই সে বামহাতের পুষ্পাঞ্জলিতেই সন্তুষ্ট হয়েছে। নাট্যকার নাটকে মূল কাহিনির পরিবর্তন না করেই নাটকীয় দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলেছেন।

৫

তারাশঙ্কর মুখার্জীর 'মনসামঙ্গল' নাটকটি ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। নাটকের বিষয় মনসামঙ্গলকাব্য থেকে গৃহীত হলেও নাট্যকার নাট্যকাহিনিতে নতুনত্ব এনেছেন। চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছে পূর্বজন্ম থেকেই। আগের জন্মে চাঁদের নাম ছিল পদ্মশঙ্খ। সাপে তার প্রাণপ্রিয় দুটি পক্ষী শাবক ভক্ষণ করলে প্রতিকারে ব্যর্থ পদ্মশঙ্খ। প্রতিশোধ নিতে প্রতিজ্ঞা করে পরজন্মে সে নাগ সংহারকরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে।

মনসা ভক্তরূপে চাঁদ সওদাগরকে পেতে চান। তাই সে নমনীয় হয়ে চাঁদের কাছে পূজা চায়—

'চাঁদ, আমি তোর কাছে অনুরোধ করছি, আমার পূজার জন্য তোর কাছে ভিক্ষা চাইছি।''[১১]

কিন্তু চাঁদ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—তাঁকে কোনো দিন পূজা করবে না। রাজ্যে মনসা পূজা নিষিদ্ধ হয়। চাঁদকে শায়েস্তা করতে মনসা তার মহাজ্ঞান হরণ করে। কোনো কিছুর বিনিময়ে মনসার বশ্যতা স্বীকার করবেন না। মনসার আক্রোশে চাঁদ ছয় পুত্র, সপ্তডিঙা হারান। ছদ্মবেশে মনসা বেহুলার বিবাহ সম্বন্ধের কথা বলে। চাঁদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণা হলেও নাট্যকার তাকে স্নেহময়ী জননীরূপে চিত্রিত করেছেন। বেহুলার বাসরঘরে বিধবা হওয়ার অভিশাপ দেওয়ার পরের মুহূর্তেই মনসার জননী সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বেহুলাকে তিনি অভয় দেন—

'আমি দেবী মনসা, তোর আরাধ্য দেবী। আমার এই অভিশাপেও তোর মঙ্গল হবে। তোর চেষ্টায়

তোর মৃত স্বামী আবার প্রাণ ফিরে পাবে। সতীত্ব গৌরবে তোর নাম ছড়িয়ে পড়বে দিগদিগন্তে।"[১২]

মনসার আশীর্বাদে বেহুলা সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়, মৃত স্বামী-ভাসুরদের ফিরে পায়। চাঁদও ফিরে পান তার সপ্তডিঙা। মনসামঙ্গলের কাহিনিকে নাট্যকার দ্রুতলয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মূল কাহিনির চাঁদ মনসার দ্বন্দ্বের সঙ্গে চাঁদের পূর্বজন্মের নাগহন্তার প্রতিজ্ঞা, বেহুলার সংগ্রাম নাটকে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

৬

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বহুমুখী নাট্যপ্রতিভার অধিকারী। নাট্যনির্দেশনা, অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা স্বাদের নাটক রচনা করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে অনূদিত নাটকসহ একাধিক মৌলিক নাটক। মনসামঙ্গলের চাঁদ বণিকের জীবন সংগ্রামের কাহিনি অনুসরণে 'সওদাগরের নৌকা' নাটকটি লেখেন। নাটকে একজন যাত্রাশিল্পীর আপাত সাফল্য-ব্যর্থতাময় জীবনকথা উঠে এসেছে। প্রসন্ন দীর্ঘদিন ধরে যাত্রায় অভিনয় করে। কখনও রাজা হরিশ্চন্দ্র, কখনওবা চাঁদ সওদাগরের ভূমিকায় অভিনয়ের মাধ্যমে অজস্র দর্শকশ্রোতার মনোরঞ্জন করে আসছে। জীবনপথে চলতে গিয়ে প্রসন্নের শিল্পীসত্তা আর ব্যক্তিসত্তা এক হয়ে যায়। নিজেই চাঁদ সওদাগর হয়ে ওঠেন। নাটকের শুরুতেই বৃদ্ধ প্রসন্নের মুখে শোনা যায়—

'মাথা নীচু করলে বড়ো লাগে। চাঁদ সদাগর কিনা মাথা নীচু করেনি।"[১৩]

তাঁর স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে বিগত দিনগুলির অভিনয়ের ছোট ছোট নানা ঘটনা। বর্তমান সময়ের অবসাদ, যন্ত্রণা ভুলে থাকতে সে বার বার অতীতে ফিরে যায়। বুঝতে পারে অভিনয়ই তাঁর জীবন। এরজন্য প্রসন্নের সাংসারিক জীবনে সাফল্য আসেনি। অভিনয়কে ভালোবেসে প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিকও হতে পারিনি। অভাব দারিদ্রতায় সংসার ছেয়ে গেছে। একমাত্র ছেলে কালোকে মানুষের মত মানুষ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাকে লেখাপড়া শেখাতে পারেনি। সামান্য পয়সার জন্য প্রসন্নকে ছেলের কাছে হাত পাততে হয়। মনসামঙ্গলের চাঁদ সওদাগরের মত প্রসন্নও নিজের জীবনের ব্যর্থতা হতাশাকে এক করে ফেলেছেন। মনসার কোপে সর্বস্ব খুইয়েও চাঁদ নিজের বিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল থেকেছেন। মাথা নত করেননি।

নাটকে চাঁদ-মনসার সংঘাত সরাসরি দেখা যায়নি। নাট্যকার দুজনের দ্বন্দ্বকে সাংকেতিকতায় উপস্থাপন করেছেন। মনসা হল এখানে চলমান সময়। প্রসন্ন হল চাঁদ সওদাগর। সময় তাঁর জীবনের অনেক কিছু কেড়ে নিয়ে তাঁকে নিঃস্ব করেছে। ছেলের হাতে মার খেতে হয়েছে। সংসার থেকে নির্বাসিত হয়ে সে দীর্ঘকাল পাগলাগারদে কাটিয়েছে। প্রসন্ন নিজের অপূর্ণ জীবনকে পূর্ণতা দিতে অভিনয়কে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। কেননা শিল্পীজীবনের সার্থকতা শিল্পচর্চায়, তুচ্ছাতিতুচ্ছ সংসারধর্ম পালনে নয়। শিল্পকে ভালবেসেই সে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যেতে চায়। বাক্সভর্তি যাত্রায় কস্টিউমগুলি পরে সেই অভীষ্ট যাত্রায় বের হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

প্রসন্নের চেতনায় অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ছেলের উপার্জিত অর্থে সে খেয়েপরে বেঁচে আছে। তাঁরও ইচ্ছা হয় সংসারে নিজে কিছু অর্থ দিতে। অন্য পাঁচজনের মত সাধারণ ছকেবাঁধা জীবনযাপন সে করতে চায়নি। জীবনের এই অপূর্ণতা থেকেই তাঁর মধ্যে জন্ম নেয় বিষণ্ণতাবোধ—

'আবার সেই রঙিন ঘরে, সেই চালচিত্র দিয়ে ছাওয়া চন্দ্রাতপের নীচে, ময়ূর পালকের মতো বিচিত্র আসরে, সব উৎকণ্ঠিত বিচিত্র চোখের সামনে সেজে দাঁড়ানো? হরিসাধন, সেদিন কি আর আসবে?"[১৪]

বাবার কার্যকলাপ পুত্র কালোর কাছে 'পাগলামি' মনে হয়। সে বাবাকে শারীরিক পীড়নও করে। কালোর মধ্যেও দেখা যায় মানসিক পরিবর্তন। কালো বুঝতে পারে তাঁর বাবা অকর্মণ্য উৎশৃঙ্খল নয়, আদর্শবাদী। তাই অনুতাপে জর্জরিত হয়ে বাবার কাছে সে ক্ষমা চায়। ছেলের সংসারে দুপয়সা দিতে এবং নিজে নতুন করে বাঁচার আশায় প্রসন্ন আবার অভিনয় জগতে ফিরে যায়। কারণ আদর্শবাদী চাঁদের মত প্রসন্নও কালরূপী মনসার কাছে হার মানেনি। আত্মমর্যাদা তাঁর এতই প্রবল যে, সে সামান্য বিদূষকের অভিনয় করেনি। মাধব গড়াই-এর সঙ্গে চুক্তি করে চল্লিশ

টাকা ও জলখাবারের বিনিময়ে চাঁদ সওদাগরের পালায় চাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করে।

নাটকে প্রসন্ন চাঁদের মত সঙ্গীহীন। বেহিসাবির মত দুহাতে পয়সা খরচ করেছে। সহকর্মী হরিসাধনও জানে চাঁদ হিসাবে প্রসন্ন অদ্বিতীয় অভিনেতা। কালিকৃষ্ণ প্রসন্নকে গোদামালোর পার্ট করার প্রস্তাব দিলে সে রাজি হয় না। স্ত্রী সতীকে আশ্বস্ত করে বলে সে চাঁদ সাজতে পারবে। কাজ করেই প্রসন্ন বাঁচবে। চাঁদের লড়াই আর প্রসন্নের জীবনের লড়াই নাটকে এক হয়ে গেছে। এখানে লড়াইটাই বড় কথা। এখানে হারলেও জিত আর জিতলেও জিত। প্রসন্ন সংগ্রামী চাঁদ সওদাগরের যথার্থ উত্তরপুরুষ হয়ে ওঠে। মনসাকথাও পায় যুগোপযোগী তাৎপর্য।

৭

বাংলা তথা ভারতীয় নাটক ও নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে শম্ভু মিত্র বিশেষ নাম। তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন ছিল ভারতীয় নাটকের একটি জাতীয় নাট্যশালা গড়ে তোলা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর আদর্শ। কারণ তিনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাটকের অপূর্ব সমন্বয় দেখেছিলেন। 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকের মাধ্যমে ভারতীয়ত্বের ছাপ রেখে যেতে চেয়েছেন। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৭ এই দীর্ঘ সময়ে ধরে নাটকটি লিখেছেন। এই সময়কালের মধ্যে ঘটে গেছে কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন, নকশাল আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, জরুরি অবস্থা ও পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা। অস্থির পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক চালচিত্রকে তুলে ধরতে বেছে নেন মধ্যযুগের জনপ্রিয় আখ্যান মনসামঙ্গল কাব্যকে। মূল কাহিনির অলৌকিকতাকে বর্জন করে নাট্যকার মনসামঙ্গলের একটি বিশেষ মুহূর্তকে গ্রহণ করলেন। শম্ভু মিত্র মনসামঙ্গল কাব্য থেকে কাহিনি গ্রহণ করলেও নাটকে মঙ্গলকাব্য করে তোলেননি। এ প্রসঙ্গে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—

> 'তিনি চাঁদ সদাগর, সনকা, বেহুলা, লখিন্দরকে মনসামঙ্গলের জগৎ থেকে অনেক দূরে টেনে নিয়ে এসেছেন। একটা সমাজে বিশ্বাসের পাঁচিলগুলো একে একে ভেঙে পড়ছে; বেনো জল ঝোড়ো হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে সব পুরোনো মূল্যবোধ। নারী এখানে কেবল পশারিনী, হয়তো একচক্ষু জননীমাত্র; অধ্যাপক শাসকের কৃপাদৃষ্টির বশ; আত্মবিক্রিত দালাল; জনতা ভীরু কাপুরুষ; যুবক নিতান্তই নিষ্ঠুর সংশয়ী। এই নতুন জগতে চাঁদ সদাগরের নবপুরাণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নাট্যকারকে অনেক সাহিত্যস্মৃতির রেশ টেনে আনতে হয়েছে। স্বাধীন কল্পনায় যে অখণ্ড সমাজসত্তা রচনায় তিনি অপারগ, তার শরীর গড়তে চেয়েছেন ঋণ করে।"[১৫]

চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যযাত্রার মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনির সূচনা। চাঁদের সঙ্গীরা সমুদ্রযাত্রার আয়োজন করে। চাঁদ তাঁদের সাবধান করে দেয়। মঙ্গলময় শিবের ভজনার জন্য পদে পদে বাধা আসবে। সমাজের লোক অপবাদ দেবে। সমস্ত বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা চাঁদের রয়েছে। চাঁদ নিজের আদর্শের প্রতি অবিচল। চাঁদের মুখে শোনা যায়—

> 'আমাদের পথ সত্য, চিন্তা সত্য, কর্ম সত্য। আমাদের জয় কেউ ঠেকাতি পারে না।"[১৬]

চাঁদের প্রতিপক্ষ মনসা। কিন্তু নাটকে কোথাও তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই। মনসা ষাট সত্তরের দশকের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির প্রতীক—'আন্ধাররূপিণী'। যিনি আড়াল থেকে সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। সহযাত্রীদের মনসাভীতি, সুবিধাবাদী মাণ্ডলিক বেণীনন্দনের বিরোধিতা, গুরু মহামাণ্ডলিক বল্লভ আচার্যের আপোষী মনোভাব চাঁদের যাত্রাকে বিধ্বস্ত করে দেয়। সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে চাঁদ একা হয়ে পড়েন। এই আকালের দিনে জ্ঞানবিদ্যার সম্মান নেই, ভদ্র আচার নেই, মাংস সুখ ছাড়া মানুষের অন্য সুখের চিন্তা নেই। গুরু বল্লভাচার্যের অনুরোধ—

> 'সত্য শুধু অন্ধকার। মনসার সর্পিল আন্ধার। এই অভিযান তুমি ছেড়্যে দেও চন্দ্রধর, আদর্শের পাছে ছুট্যে কোনো লাভ নেই।"[১৭]

এককালে গুরু বল্লভাচার্য চাঁদকে সত্য পথে চলার উপদেশ দিয়েছিলেন। গুরুর এহেন মানসিক পরিবর্তনে চাঁদ

আহত হন। চাঁদের ধর্মপত্নী সনকা ঘরে মনসার ঘট পেতে পূজা করলে তাঁর চোখে তা অসহনীয় হয়ে ওঠে। স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা চাঁদকে পীড়া দেয়। মনসার ঘট ভেঙে সে প্রতিবাদ করে। ভৃত্য নেড়া খবর দেয় তাঁর ছয় পুত্র সর্পবিষে মারা গেছে। বল্লভাচার্যের আদেশ আসে গাঙুড়ের জলে নৌকা ভাসানো যাবে না। বিরুদ্ধ শক্তি চাঁদকে দমিয়ে রাখতে পারে না। চাঁদ স্বপ্ন দেখে তাঁর আরও পুত্র হবে। আঁধাররূপিণী মনসার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে তাকে যাত্রা করতেই হবে। যাত্রা করেও চাঁদের শেষ রক্ষা হয় না। কালিদহের জটিল ঘূর্ণিপাকে পড়ে সব হারিয়ে যায়। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ কারও জানা নেই। তাই সবাই চাঁদকেই দোষারোপ করে। পুত্র লখিন্দরও নিজের পিতাকে ভুল বোঝে। অভিযোগ করে—

> 'নিজেরে যে মানুষের চায়্যা কিঞ্চিত বিরাট-আকৃতি বল্যে মনে কর্যেছিলে এই অপরাধ। নাটুয়ার মত রাজা সেজ্যে ভেব্যেছিলে সত্য বুঝি রাজা হয়্যা গেছ, বিষ্ঠার টিবিতে খাড়া হয়্যা ভেব্যেছিলে ডিঙি মেরে বুঝি আকাশটা ছুঁয়্যে দেওয়া যায়, এই অপরাধ, তই, তোমার পত্নীর আর তোমার পুত্রের জীবনট্যা তছনছ কর্যে দেছ,—না, অপরাধ নয়—পাপ। এ তোমার পাপ।''[১৮]

চাঁদ আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। পাশে দাঁড়ায় পুত্রবধূ বেহুলা। শ্বশুরের কর্মপ্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়ে সে স্বামীর ভুল ভাঙায়। লখিন্দরও পিতার প্রতি আন্তরিক হয়ে পিতার সহচর হতে চায়। চাঁদ তাঁর মৃত সঙ্গীদের ডাকেন। তাঁদের নিয়েই শিবের সন্ধানে পাড়ি দিতে চান।

স্বামীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য বেহুলাকে স্বর্গে গিয়ে নাচতে হয়। বেহুলার আত্মত্যাগের আদর্শকে মর্যাদা দিতে চাঁদ অবশেষে মনসার পূজা করেন। পুনর্জীবন পেয়ে লখিন্দর যখন জানতে পারে তাঁর জন্যই তাঁর পিতা ও স্ত্রী নিজেদের আদর্শ, মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে মনসার পূজা করেছেন। তীব্র অপমানবোধ ও অনুতাপে লখিন্দর ও বেহুলা বিষপান করে আত্মহত্যা করে। এখানেই নাট্যকার কাহিনিতে মৌলিকতা এনেছেন। রচনা করেছেন মনসামঙ্গলের নতুন ভাষ্য। লখিন্দরের এই হতাশা, অসহায়তা তাঁকে সত্তর দশকের যুবসমাজের প্রতিনিধিরূপে তুলে ধরেছে। নিজেদের আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে তারা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ঘটে যায় মনসামঙ্গল কাহিনির বিনির্মাণ।

নাটকের অলৌকিকতা নেই। মনসামঙ্গলের চাঁদ মনসার বৈরিতার সম্পর্কে অলৌকিকতা আসলেও এখানে একান্ত জাগতিক কৌশলে ব্যবহৃত হয়েছে। বিষ মেশানো খাবারে ছয় পুত্রের মৃত্যু, চাঁদের চরিত্র কলঙ্কময়, সনকা অসতী, ভয় দেখিয়ে বাসরঘরে ছিদ্র রাখা প্রভৃতি। নাটকও মনসামঙ্গলের মত মিলনান্তক হয়নি—এক বিয়োগান্তক পরিণতি দিয়েই পরিসমাপ্তি হয়েছে। সাময়িক সফলতা বা ব্যর্থতার চেয়ে জীবনে লড়াই করে বেঁচে থাকাটাই বড় কথা। চাঁদ লড়ে গেছেন। নাটকে মানুষের সঙ্গে মানুষের লড়াই, আলোর সঙ্গে অন্ধকারের লড়াই, সত্যের সঙ্গে মিথ্যার লড়াই বড় হয়ে উঠেছে।

৮

বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাট্যকার, নাট্যতাত্ত্বিক হলেন সেলিম আল দীন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্য বিষয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণার পাশাপাশি বহু নাটক রচনা করেছেন। পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী ভাবনার সঙ্গে বাংলার শিল্প সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁর নাটকগুলিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। নিজের গবেষণাকর্মে বাংলার দেশজ ঐতিহ্যের কথা বলেছেন—

> 'বাংলা নাটকে দেশীয় রীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যসমূহ-শাবারিদ খানের বিদ্যাসুন্দর-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পাঁচালি-যাত্রা ইত্যাদি ছিল আমাদের আশ্রয়স্থল।''[১৯]

সেলিম আল দিনের উল্লেখযোগ্য নাটক হল—কিত্তনখোলা, কেরামতমঙ্গল, চাকা, হরগজ, যৈবতী কন্যার মন, প্রাচ্য। 'প্রাচ্য' মনসামঙ্গলের কাহিনি ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকটি রচনার নেপথ্যে রয়েছে নাট্যকারের ব্যক্তি অভিজ্ঞতা। তিনি জানিয়েছেন—

'১৯৯৫ কি ৯৬ সালের শীতান্তে আমি তালুকনগর যাই আজাহার বয়াতির মাঘীর মেলার কাজে। যাবার দিনের প্রথম রাত্রি ভোরে শ্বশুর বাড়ির সুউচ্চ ভিটায় খড়ের পালা থেকে পালানে একটি অতিশয় দীর্ঘ আঁকাবাঁকা একরৈখিক কর্ষিত ভূমি দেখতে পেয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করি। তাতে সে বাড়ির আশেপাশের কৃষিজীবীগণ মাটি খুঁড়ে একটি বিশালাকায় গোখরো সাপের নিধন পর্বের উত্তেজক বর্ণনা দেবার চেষ্টা করে। এই দৃশ্যে হঠাৎ আমার মনে হল জীবনের অনিবার্য খনন কি আমরাও করে চলেছি না? এদিকে আফসার আহমদ-এর কাছে ১৯৮৪-৮৫ সালে মানিকগঞ্জের জামশা অঞ্চলে বিবাহ পরবর্তী রাত্রে এক বরের ডঙ্কজনিত মৃত্যুর বাস্তব কাহিনী শুনে ভেবেছিলাম—মনসাপুরাণের উল্টা দিকটা তবে কি রকম।"[২০]

সত্য ঘটনার সঙ্গে মনসামঙ্গলের লৌকিক কাহিনির সংমিশ্রণে 'প্রাচ্য' নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে সয়ফর ও তার প্রতিশোধস্পৃহা। দিনমজুর সয়ফর নিজের সর্বস্ব বন্ধক রেখে বিয়ে করেছিল নোলককে।

মনসামঙ্গলের কাহিনিতে মনসার তেজের বিপরীত ছিল চাঁদ সওদাগরের পৌরুষ, প্রতাপ। বেহুলার লড়াইকে সবাই কুর্নিশ জানিয়েছিল। নাটকে মনসামঙ্গলের মূল কাহিনি ও চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে। কাব্যে বাসরঘরে সর্পাঘাতে মৃত লখিন্দরের প্রাণ ফিরে পেতে বেহুলা কঠিন সংগ্রাম করেছিল। মনসার প্রতি সে বিদ্বেষ পোষণ করেনি। তবে নাটকে সয়ফরের স্ত্রী নোলক বাসরঘরে সর্পাঘাতে মারা গেলে সয়ফর ঘাতক সাপটিকে মারার জন্য একেবারে উন্মাদ হয়ে ওঠে—

'ঐ শুয়োরের বাচ্চার সন্ধান করি। আমার শ্যাষ জমির বন্ধক টেকায় বিয়ার বউটারে খাইছে যে। আমি সাপের সন্ধান করি। খুনের বদলা খুন করতে চাই।"[২১]

নাটকে বেহুলা-লখিন্দর, সয়ফর-নোলক চরিত্রগুলির পারস্পরিক সংবদল ঘটে যায়। মনসামঙ্গলে পুরুষ লখিন্দর ছিল মৃত। আর এখানে নারী। প্রিয়জনের মৃত্যুতে বেহুলা ও সয়ফর উভয়েরই চারিত্রিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বেহুলা হয়েছে সংগ্রামী তপস্বিনী। সয়ফর হতে চেয়েছে প্রতিহিংসা পরায়ণ এক সর্পঘাতক। মনসামঙ্গলের এমন অভিনব উপস্থাপনা সেলিম আল দিনের নাট্যদক্ষতার পরিচয় বহন করে।

মনসামঙ্গল হিন্দু দেবীর মাহাত্ম্যকথা। এই কাব্যের পাঠক শ্রোতা অধিকাংশই হিন্দু সমাজের লোক। আবার নাটকের নায়ক নায়িকা সয়ফর ও নোলক দুজনেই মুসলমান। নাটকে মনসামঙ্গল থেকে নেওয়া মনসা, বেহুলা-লখিন্দরের লোহার বাসরঘর, মনসার ভাসান বিষয়গুলির যথাযথ ব্যবহার করছেন নাট্যকার। সয়ফর-নোলকের বাসরশয্যা হয়েছিল সয়ফরের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মনসা খাটে। মনসার ভাসান শোনে সয়ফর-নোলক সহ অজস্র মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজন। হিন্দুদের দেবী মনসা মুসলিম সমাজে হয়েছেন 'ফতেমা মনসা'। তাদের বিশ্বাস মনসার ভাসান শুনলে সর্পবিষ প্রশমিত হয়। রুগী ধীরে ধীরে সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয় সয়ফর ও নোলকের সাক্ষাৎ হয়েছিল কাজলাকান্দা গ্রামে মনসার ভাসান শুনতে গিয়ে। বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহপূর্ব প্রণয়কথা অপূর্ব দক্ষতায় পরিবেশন করেছেন নাট্যকার।

সেলিম আল-দিন হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির সুর রচনা করেছেন প্রাচ্য নাটক। মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যকে নতুন করে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। সময়ের প্রেক্ষিতে মনসামঙ্গলের মূলকাহিনি ও চরিত্রের রূপান্তর ঘটিয়েছেন। তাই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের গৌরব বহন করে 'প্রাচ্য'।

৯

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক রচিত মঞ্চনাটক 'বেহুলা'। নাটকটি ১৯৯৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মনসামঙ্গলের চিরাচরিত কাহিনিকে অবলম্বন করে শিব-পার্বতী, বেহুলা-লখিন্দর ও চাঁদ সওদাগর চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সমগ্র নাটকটি স্বর্গ ও মর্ত্য পৃথক দুটি খণ্ডে নাট্যকাহিনি বিন্যস্ত।

নাটক শুরু হয়েছে শিব ও পার্বতীর সাংসারিক কলহের মধ্য দিয়ে। মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ডের অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে তাঁদের সংসার জীবনের কথা। নাট্যকার শিব-পার্বতীর ঝগড়া-বিবাদকে বর্তমান সমাজের নারীত্বের অবদমনের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন। শিব অলস কর্মবিমুখ নেশাখোর গৃহস্থ। স্ত্রী পার্বতী তাঁকে ভালবেসে সংসার করতে চায়। স্বেচ্ছাচারী শিবের কাছে সে সামান্য একটু তুচ্ছ নারী। স্বামীর সোহাগের পরিবর্তে পার্বতীর কপালে জোটে মানসিক অত্যাচার। তাই শিবের মতন নেশাতুর পুরুষকে বিয়ে করে সে অনুশোচনা করে।

পুরুষশাসিত সমাজ একজন পুরুষের সর্বত্র বিচরণের অনুমোদন দেয়। নারীর ক্ষেত্রে আরোপিত হয় নানা বিধিনিষেধ। অনুসংহিতা-নির্দেশিত পুরুষসমাজ আজও মনে করে মেয়েরা কৈশোরে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বৃদ্ধকালে পুত্রের অধীন। মঙ্গলকাব্যে শিব কিংবা চাঁদ সওদাগরের বহুগামিতার পরিচয় মেলে। পুরুষের যথেচ্ছাচারের কলঙ্ক কেবল নারীর গায়েই লাগে। এক সাধ্বি নারীকে দেহদানে বাধ্য করে ক্ষমতাবান পুরুষ। পরিস্থিতির চাপে পড়ে অন্যায়কে মেনে নিতে বাধ্য হয়। নাটকে দেখা যায় বেহুলার মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিদানস্বরূপ শিব বেহুলাকে কামনা করে—

> ‘এসো ধরা দাও এ বাহুর বন্ধনে ... পতি ফিরে পাবে, আমায় তুষ্ট করো, যৌবন দান করো।’’[২২]

মনসামঙ্গলের দুই প্রতিপক্ষ হলেন মনসা ও চাঁদ সওদাগর। মনসামঙ্গল আশ্রিত এই নাটকে চরিত্র হিসেবে কোথাও মনসা নেই। নাট্যকারের আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে ফ্যাসিস্ট পুরুষসমাজ। তাই নাটকে পার্বতী-বেহুলা বনাম শিব-চাঁদ-লখিন্দরের মধ্যে সংঘাত দেখা গেছে। বেহুলার অভিনব জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়েছেন যা মূল কাহিনি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বেহুলা স্বর্গের নর্তকী ঊষা নয়, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা মানস কন্যা তিলোত্তমা। সুন্দ-উপসুন্দের বিনাশ করতে বিশ্বকর্মা তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন তাকে। নারীর সৌন্দর্য বর্ণনায় বেহুলা ও তিলোত্তমাকে অভিন্নরূপে দেখানো হয়েছে।

মনসামঙ্গল কাব্যে লখিন্দর চরিত্রটিকে সেভাবে সক্রিয় হতে দেখা যায় না। নাটকে বেহুলা-লখিন্দরের সম্পর্কের টানাপোড়েন নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে। বেহুলার আত্মত্যাগকে সে অস্বীকার করে। পরপুরুষের মনোরঞ্জনের বিনিময়ে লখিন্দর প্রাণ ফিরে পেয়েছে। স্ত্রীর দৈহিক শুচিতা বড় হওয়ায় সে বেহুলার পরিচয় ঘরে ফিরতে চায় না।

শিবভক্ত হিসেবে চাঁদ সর্বজনবিদিত। পুত্র, বিষয়-আশয়ের বিনিময়ে নিজের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতে চাননি। সবাইকে ত্যাগ করে একাকী থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু দেবতার প্রতি বিশ্বাস তাঁর এক লহমায় ভেঙে যায়। যখন পুত্রবধূ বেহুলার মুখ থেকে শোনে ‘দেবতারা মাংসাশী কীট’। দেবতার দেবত্বে তাঁর মনে সন্দেহ জাগে—‘জগতের মানুষ কি দেবতার ছলনার শিকার?’’[২৩] উপাস্য দেবতা অন্যায়কে মেনে নিতে পারেন না। সে উপলব্ধি করে—

> ‘শোন দেবতা, জানলাম, লখিন্দরের প্রাণ তোমার করুণায় নয়। আজ আমি মানব ও দেবতার বিচারক-মানুষের সামাজিক বিধিমতে হবে বিধি মতে হবে দেবতার বিচার। আকাশের দেবতারা শোন, আমার অভিশাপ নাও, ঘৃণা নাও অন্তরের-মানুষের শ্রদ্ধার্ঘ্য নরকের আগুন হয়ে জ্বলে উঠুক দাউ দাউ করে—স্বর্গরাজ্য পুড়ে যাক ধ্বংস হয়ে যাক—মানুষের হৃদয় থেকে মুছে যাক দেবতার গান।’’[২৪]

শিবভক্ত চাঁদ থেকে দেবোদ্রোহী চাঁদের এই রূপান্তর অভিনব।

পুরুষকর্তৃক রচিত ইতিহাসে নারী চিরকালই ব্রাত্য ও পুরুষনির্ভর। সেখানে পৌরুষের স্তুতি স্থান পেলেও নারীর বিজয়কথা সেভাবে গুরুত্ব পায় না। সাহসিকতায় বেহুলা চাঁদের ছয়পুত্রের কাছে যথার্থ ‘বীরাঙ্গনা’রূপে বিবেচিত হলেও চাঁদ বেহুলাকে গ্রহণ করতে অসম্মত হন। অকৃতজ্ঞ লখিন্দর স্ত্রীকে ছেড়ে একাকী স্বর্গে থেকে যেতে চায়। তাই বেহুলাকে স্বামী উদ্দেশে বলতে শোনা যায়—

> ‘হায় লখিন্দর, তোমার কথা রবে ইতিহাস হয়ে, অথচ বীরাংগনা কখন বারাংগনা হলো সে কথা হবে না কারো জানার অবকাশ। বিধাতা, তুমি কি জানো, আমার গর্ভে যে শিশু বাস করে—এই পৃথিবীতে,

সে কি পরিচয়ে হবে পরিচিত—মুক্ত মানব—না জারজ সন্তান?"[২৫]

নাট্যকারের নারীবাদী সমাজভাবনায় মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলার আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের কাহিনি নতুন তাৎপর্য পেয়েছে। যা একালের নারীমুক্তি আন্দোলনকে উজ্জীবিত করেছে।

১০

নাট্যকার উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলকাব্য অবলম্বনে 'মনসামঙ্গল' নাটকটি লিখেছেন। মূল চরিত্রগুলির কোনও পরিবর্তন করেননি। মনসার আত্মপ্রতিষ্ঠা ও চাঁদ সওদাগরের অহংকারের ফলেই বেহুলার জীবনে নেমে আসে করুণ পরিণতি। নাট্যকার বণিক চাঁদকে গায়করূপে উপস্থিত করেছেন। শিবকেই সে দেবতা জ্ঞান করে। মনসা তাঁর কাছে তুচ্ছ নারী। চাঁদের অহংকার 'চ্যাংমুড়ি কানি' তার কি করবে? মনসাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করে তাঁকে উচিত শিক্ষা দেবেন। কামিনীবেশে মনসা চাঁদকে প্রলুব্ধ করে। হরণ করে নেয় তাঁর মহাজ্ঞান। চাঁদ হারায় ছয়পুত্রকে। নিজের দুঃখ-শোকের জন্য নিজেকেই দায়ী করে। যে কোনো পরিস্থিতির জন্য সে সদাপ্রস্তুত। মনসার কাছে সে নাস্তানাবুদ হলেও নিজের বিশ্বাসে অটল থাকে। দুঃসময়ে চাঁদ বন্ধুর গৃহে আশ্রয় পায়। সেখানেও তাঁকে বিতাড়িত করা হয়। কারণ সে মনসাপুজোয় নিষেধ করে। চাঁদ নিজের গানের কণ্ঠ হারায়।

নাটকে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে চাঁদের পুত্রবধূ বেহুলা। চাঁদ ও মনসার অযৌক্তিক লড়াই-ঝগড়ার বিরুদ্ধে বেহুলা সোচ্চার। অপবাদে জর্জরিত তাঁর দৃপ্তকণ্ঠে শোনা যায় জ্বালাময়ী সংলাপ—

'বাপ হে .... তোমার অহং আর মনসার অহং মিলে—এই দুই সর্প মিলে কেটেছে মোর স্বামীরে।"[২৬]

মানুষ মেরে মানুষ শাসন বেহুলার কাছে অসহনীয়। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর কাছে পূজার হিসাব চায়। বেহুলা কতবার শিবের পূজা, কতবার ইন্দ্রের পূজা করেছে। হিসাব করেই লখিন্দরের প্রাণদান করা হবে। ইন্দ্রের দ্বিচারিতার জন্য তাঁকে সে 'দুষ্ট' বলে। শিবকন্যার সঙ্গে চাঁদের বিবাদের ফলেই বেহুলার নিরপরাধ স্বামী মারা গেছে। নেতাও স্বীকার করে তার কথামতো মনসা চাঁদের ক্ষতি করেছে।

বেহুলা নির্ভীক। সে কারও পায়ে ধরবে না। কারণ সে কোন অন্যায় করেনি। রাজনৈতিক আনুগত্যকে অস্বীকার করে। তার মনে হয় আনুগত্য দিয়ে পূজা হয় না। দেবরাজ ইন্দ্র মনসাকে দেবতা বলেই মানেন না। মনসা পূজার বিনিময়ে পুত্রের জীবন ফিরে পেতে চায় না চাঁদ। বেহুলা চাঁদকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করে। আঘাত করে শ্বশুরের অহংসর্বস্বতায়।

'কারে কেন পূজা দাও নিজেই জানো না সদাগর! তোমার তো পূজা নয়। পূজার অহং। শিব ভারী দেবতা বিশেষ জেনেছ ব্যাস—ওইতেই আমিত্ব পরিতুষ্ট তোমার! পূজা তোমার ভড়ং—তুমি নিজেকে পূজা করো খালি।"[২৭]

যুক্তিবাদী বেহুলা চাঁদ-মনসার মধ্যেকার রাজনৈতিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের উর্দ্ধে। চাঁদ-মনসা দুজনেই বোঝে তাঁদের চোখ নেই। মনসাও বোঝে জোর করে পূজা নয়। সে দেবী নয়, মানুষ হতে চায়। মনসার মধ্যে মানবীসত্তার জাগরণের পিছনে বেহুলারই ভূমিকা রয়েছে। মনসার কথায়—

'পূজা তো তুমি পাবে একাকী লড়াকু মেয়ে, তুমি সেই দেবী—মানুষের মাঝে যার অধিষ্ঠান—প্রেমিকের জীবন সন্ধানে যে নিজের জীবন করে পণ।"[২৮]

চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্ব মিটে গেলে চাঁদের ভৃত্য নেড়ার মুখে মনসার জয়ধ্বনি শোনা যায়। চাঁদের হাতের হেঁতালের লাঠির আদর পেতে চায় মনসা। নিজের সাপগুলি ধন্বন্তরিকে দিতে বলে সাপের বিষে ওষুধ বানানোর জন্য। এইভাবে নাটকের শেষে নাট্যকারের পরিবেশভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। আর মঙ্গলকাব্যের কাহিনি আধুনিক ভাবনাপ্রসূত শিল্পে উন্নীত হয়েছে।

১১

মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আখ্যানকাব্য। কাহিনির নাটকীয় পরিণতি, ব্যক্তিচরিত্রের অনমনীয় ও তেজস্বীভাব এবং সর্বোপরি করুণরসের প্রয়োগ নাট্যামোদী দর্শকের কাছে মনসামঙ্গলকে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় বেশি গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। নাট্যকারদের নাট্যপ্রতিভা গুণে মধ্যযুগীয় গতানুগতিক এই কাব্যধারা পেয়েছে নব কলেবর। পরিচিত পুরানো এই মনসামঙ্গল কাব্যের মাধ্যমেই প্রবাহমান সময়ের নরনারীর মনস্তত্ব, লিঙ্গবৈষম্য, রাজনৈতিক গোষ্ঠীসংঘাত, আনুগত্যহীন আদর্শবাদ, পরিবেশভাবনার মত বহুলচর্চিত বিষয়গুলি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সূত্রনির্দেশ

১. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, চর্যাগীতির ভূমিকা, ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২১১।

২. মন্মথমোহন বসু, বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৪৮, পৃ. ৪৬।

৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬১, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পৃ. ৫৫-৫৬।

৪. হরনাথ বসু, বেহুলা, প্রকাশক অজ্ঞাত, ১৯১০, পৃ. ৬৮।

৫. তদেব, পৃ. ২৭-২৮।

৬. চাঁদ সদাগর, মন্মথ রায়ের গ্রন্থাবলী, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৭৪।

৭. তদেব, পৃ. ৭৯।

৮. তদেব, পৃ. ১০৮।

৯. ভূমিকা, পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়, চাঁদ সদাগর (বেহুলা), পাল ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৩০।

১০. তদেব, পৃ. ১০।

১১. তারাশঙ্কর মুখার্জী, মনসামঙ্গল, সচদেব পুস্তকালয় এণ্ড প্রেস, কলকাতা, ১৩৬৬, পৃ. ২২।

১২. তদেব, পৃ. ৫০।

১৩. সওদাগরের নৌকা, সন্ধ্যা দে সম্পাদিত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২৯৩।

১৪. তদেব, পৃ. ৩১৮।

১৫. শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, চাঁদ বণিকের পালা, অপূর্ব দে সম্পাদিত চাঁদ বণিকের পালা : আধুনিক উপাখ্যান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ২৬-২৭।

১৬. শম্ভু মিত্র, চাঁদ বণিকের পালা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ : মাঘ ১৪১৯, পৃ. ১৪।

১৭. তদেব, পৃ. ২৫।

১৮. তদেব, পৃ. ৭৭।

১৯. সাইমন জাকারিয়া সম্পাদিত, সেলিম আলদীন রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩৩২।

২০. পরিশিষ্ট, মোঃ কামরুল হাসান সংকলিত ও গ্রন্থিত, সেলিম আলদীন নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৫৭১।

২১. তদেব, পৃ. ৮৬।

২২. সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক, বেহুলা, উত্তরাধিকার বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৫৬-৫৭।

২৩. তদেব, পৃ. ৮৬।

২৪. তদেব, পৃ. ৯১।

২৫. তদেব, পৃ. ৯৫।

২৬. মনসামঙ্গল, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, তিনটি উজ্জ্বল নাটক, ধানসিড়ি, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৩৭।
২৭. তদেব, পৃ. ১৫৭।
২৮. তদেব, পৃ. ১৫৯।

সুনির্মল বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড

শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্যে মেয়েদের কথা

রিঙ্কু রায়

উনিশ শতকের পরিমণ্ডলে নারীশিক্ষা, বিবাহে স্বনির্বাচন, বাল্যবিবাহের এবং অবরোধ প্রথার বিপক্ষে নারীর যে লেখনী বিশ শতকে তা আরও পরিবর্তনশীল, এখানে নারী আপন অধিকার বুঝে নেওয়ার লড়াইয়ে শতগুণ এগিয়ে। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আলো ব্যক্তিমানসে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জাগায়। এই আগ্রহের বশেই সেকালিনীরা চারুপাঠ ও বোধোদয়কেন্দ্রিক যে শিক্ষা গ্রহণের মাপকাঠি তা অতিক্রম করার সুযোগ পেয়ে রেখেছে বিদেশ বিভূঁইয়ে পা। এনাদের পথেই পা বাড়িয়েছেন উনিশ শতকের মাঝ ও শেষার্ধের অনেক নারী কথা সাহিত্যিক। তাঁদের জীবনযাত্রা প্রণালী, আবহাওয়া, নারীমনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তাধারার মাধ্যমে সাহিত্যকে সাজিয়ে গেছেন যার কৃপায় আমরা সমৃদ্ধ। তাই উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুর যে পরিমণ্ডল সেই বৃত্তের অন্তর্গত লেখিকা 'শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্যে মেয়েদের কথা' আমার আলোচ্য বিষয়। এই আলোচনার মাধ্যমে নানান বাধা বিপত্তি পার হয়ে মেয়েদের এগিয়ে চলার চিত্র দেখতে পাব আর শুনতে পাব প্রতিবাদে গর্জে ওঠা কণ্ঠস্বর এছাড়াও দেখতে পাব বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মেয়েদের যাপন চিত্র।

শৈলবালা ঘোষজায়ার জন্ম ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের কক্সবাজারে। পিতা কুঞ্জবিহারী নন্দী ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন। মা ছিলেন হেমাঙ্গিনী দেবী। বিবাহের পর প্রতিকূল পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করেও তিনি যে সাহিত্য ভাণ্ডার আমাদের দিয়ে গেছেন তার অবদান অসামান্য। তিনি তাঁর উপলব্ধিজাত উপাদানকে সুন্দরভাবে ভাষা দান করেছেন। মানব অস্তিত্বের যাবতীয় ছবি অবিকৃতভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর গল্প, উপন্যাসের ক্যানভাসে। সমাজের যে বিষয় তাঁর হৃদয়ে দাগ কেটেছে তা দিয়েই তিনি তাঁর সাহিত্যের আঙিনা ভরিয়ে তুলেছেন। তাঁর রচনায় মেয়েদের শিক্ষা অর্জনের চিত্র তিনি কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা আলোচ্য বিষয়ে দেখানোর চেষ্টা করব। এর পাশাপাশি থাকবে অন্যান্য বিষয়ও।

তাঁর রচনার একটা বড় অংশ জুড়ে প্রতিকূলতার মধ্যে মেয়েদের শিক্ষা অর্জন, সচেতনতার বোধ তৈরি হওয়ার চিত্র দেখা যায়। এখানে শিক্ষা অর্জন করতে গিয়ে নানান বিপত্তি ও লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে নারীকে। কখনও কখনও নারীকে শিক্ষা অর্জন করতে গিয়ে আপনজনের পরিবৃত্তের বাইরে যেতে হয়েছে। কখনো বা সমাজের দিকে তাকিয়ে নারীকে পরিবার করেছে পরিত্যাগ। এই রকম নানা দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে নারীকে কেবল শিক্ষালাভের জন্য।

এছাড়াও নারী শিক্ষা অর্জন করলেও তার বিচার বিবেচনাকে প্রাধান্য দেবার পথেও আসে নানান বাধা যাকে অতিক্রম করতে নারীকে পেতে হয়েছে অনেক দুর্ভোগ। এর পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে শিক্ষিতা নারীর স্বাধীন বিচরণের পথেও আসে কিছু মানুষের অসৎ অভিসন্ধি যার ফলস্বরূপ সমাজ বারংবার নারীর চরিত্রের দিকে করে অঙ্গুলি নির্দেশ। এইভাবে প্রতিকূলতার মধ্যে সফল হওয়া নারীকে চিকিৎসক, লেখিকা, শিক্ষিকা হতে দেখা যায় তাঁর রচনায়। আবার কখনও সঠিক বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন নারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে তোলে প্রতিবাদের ভাষা আবার কেউবা সমাজ ও পরিবারের চাপে মুখ বুজে সহ্য করে সমস্ত নির্যাতন, হয়েছে গৃহবন্দি। এছাড়া শিক্ষা অর্জন করে নারীকে সমাজ সচেতন, স্বাস্থ্য সচেতন হিসাবে যেমন দেখা গেছে তেমনি অর্থ উপার্জনের জন্য লেখনিকে বেছে নেওয়া নারীকে একঘরে করে দেওয়ার মত চিত্রও দেখা যায় রচনায়। এছাড়াও সংসারে আবদ্ধ নারীর নিয়মমাফিক জীবনচর্যা, সতীত্ব নষ্ট ও খুন করেও প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন মানুষের দাপটের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্য তাঁর

রায়, রিঙ্কু : শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্যে মেয়েদের কথা
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 2, Dec 2021, Page : 21-26, ISSN 2249-4332

রচনায় দৃশ্যমান। এইভাবে লেখিকা মেয়েদের শিক্ষা অর্জন এবং এই সংক্রান্ত নানান বিপত্তিকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সেই চিত্র এবং অন্যান্য পরিস্থিতিতে কিভাবে নারী অবস্থান করছে তা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব কয়েকটি রচনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের চিত্র পাই 'লাফো' গল্পে। প্রথমেই রেঙ্গুনে বসে এক ঠিকাদারির কাজে নিযুক্ত ব্যক্তির সাথে লাফোর দেবদারু গাছের তলায় বসে জীবনের ইতিহাস বলার চিত্র আছে। এখানে লাফো জানায় বাঁকুড়া জেলার সোনাগঞ্জে রায়বাহাদুরের জমিদারী মহল্লায় তার কাজ ছিল। বাবা মারা যাবার পর খুড়ার কাছে মানুষ খুড়ার দুই সন্তান শঙ্কর ও শোভা। শোভার বিয়ে কাকার মৃত্যুর জন্য বন্ধ থাকে তখন কুসুমপুরে দে-দের জমিদারী সেরেস্তায় কাজ নেয়। এমন সময় লাফোকে কেন্দ্র করে রায়বাবুরা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়ে। শোভাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার খবর শঙ্কর তাকে দিতে এলে সে তৎক্ষণাৎ ভোজালি নিয়ে বেরিয়ে রায়বাবুদের বাড়ির মহলে সোজা ছোটো বাবুর ঘরে গিয়ে গলায় ভোজালি ধরলে তার স্ত্রী করুণ মিনতি নিয়ে ছেড়ে দিতে বলে। অবশেষে আওয়াজে নীচ থেকে লোক উপরে আসে সেই মুহূর্তে শঙ্করকে নিয়ে ছাদ থেকে ঝাঁপ দেবার কথা ভাবে শঙ্কর দেরী করলে ভোজালি দিয়ে তার মাথা কেটে ঝাঁপ মারে। অনেক দৌড়ে সংজ্ঞা হারায় যখন সম্বিত ফেরে তার হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। অবশেষে সেই মুণ্ডু এই দেবদারু গাছের তলে মাটি দিয়ে রাখে। এদিকে বাড়িতে খুড়ি জানে শঙ্কর তার কাছে নিরাপদে আছে, এইভাবে তার কৃতকর্মের জন্য লাফোকে যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে দেখা যায়। এর পাশাপাশি জমিদার শ্রেণির দুর্মতি ও অর্থের প্রভাব প্রতিপত্তিতে কুকর্মের কথা চাপা পড়ে যাওয়ার দৃশ্যও দেখা যায় তার বোনের জলে মৃতদেহ পাওয়ার মিথ্যা রটনায়।

এরপর আমাদের আলোচ্য শিক্ষা-বিষয়ক রচনাগুলি। প্রথমেই 'দীপ্তি' গল্পে দীপ্তিকে শিক্ষিত, যুক্তিনির্ভর প্রতিবাদী চরিত্র হিসাবে দেখা গেছে। গল্পের শুরুতেই সরকারবাবুর বিমলার বাড়িতে এসে মেয়েদের সেলাই শিক্ষার বহর দেখে আক্ষেপকালে দীপ্তি এসে সরকারবাবুর ভ্রাতৃবধূর থেকে টাকা ঠকিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে তাকে থামিয়ে দেয়। এইসময় ভ্রাতৃবধূর নালিশ ওয়ারেন্ট নিয়ে কথা তুললে দীপ্তি প্রতিবাদী কণ্ঠে বলে—

> 'আজ আইনের তাড়া খেয়ে ভাসুর গুরুজন সেজে মানের কান্না কাঁদলে চলবে কেন? সময়ে নিজের গুরুত্ব মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত ছিল।''[১]

তারপরই সরকারবাবু চলে যায়।

এদৃশ্য বিমলার বড়দি দেখে এবং দীপ্তির শিক্ষা নিয়ে মন্তব্য করে সরকারবাবুকে রাগানোর কাজটা ভালো করেনি বলে জানায়। তখন দীপ্তি বড়দিকে জানায়—

> 'লেখাপড়া শেখাটা একটা বিশেষ শ্রেণীর আলস্য-বিলাস বা ফ্যাসন মাত্র নয়। মানুষ হওয়ার পক্ষে, বেঁচে থাকার পক্ষে সৎ এবং ভদ্র হওয়ার পক্ষে, জ্ঞানচর্চা অত্যন্ত আবশ্যক।''[২]

এইভাবেই দীপ্তির প্রতিবাদী, যুক্তিবাদী, স্পষ্টবাদী হৃদয়ের পরিচয় পাই।

তারপর বড়দি ও দীপ্তি-র কথোপকথনে আসে মেয়েদের শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে মনুর শাস্ত্র উল্লেখিত কয়েকটি শ্লোক, যুক্তি ও ঠাট্টা। তাইতো বিমলার স্বামীর বাড়িতে বসে থাকার বিষয়টা ঠাট্টা করে বলে—''দ্বারাধীনস্তথা স্বর্গঃ!''[৩] বড়দি প্রথমে রাগলেও পরে দীপ্তির যুক্তিমূলক কথায় আপ্লুত হয়। এমন সময় দীপ্তিদের বাড়ির ভৃত্য এসে জানায় দাদু ডাকছে। এহেন হুকুমে দীপ্তির আর বুঝতে বাকি থাকে না সরকার বাবুর দাদুর কাছে নালিশের কথা। তাই তৎক্ষণাৎ সে উঠে যায়।

এরপর দাদুর সামনেও সরকার বাবুকে আইনের প্রসঙ্গ টেনে তার কৃতকর্মের পরিবর্তন করতে বলে। অবশেষে সরকারবাবু দীপ্তির দৌলতে সৎপথে উপার্জনের আস্থা পায় এবং তার ভ্রাতৃবধূদের ন্যায্য অধিকার দিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে রাজী হয়।

এরপরে বড়দির কাছে সরকারবাবুর সুমতির কথা জানাতে গেলে বড়দি সানন্দে বলেন—

> ‘একেই তো বলে সুশিক্ষা। সৎ কার্য্যে, যত্নশীল, উৎসাহ-উদ্যম-তৎপর না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ।”[৪]

এই কথা জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে প্রকাশ করে। এইভাবে দীপ্তির মত প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষেরই বিবেচনাবোধ ও অন্যায়ের প্রতিবাদ বাঞ্ছনীয়।

এরপর ‘শিশুর স্মৃতি’ গল্পে দেখা যায় জাতপাত প্রসঙ্গ, শিক্ষাগ্রহণে যাতনা, বাল্যবিবাহ, ভূণহত্যার প্রসঙ্গ। গল্পের শুরুতেই মিসেস অগস্তির হাতের স্লফ থেকে যন্ত্রণার দৃশ্য ও ডাক্তারের আগমন দিয়ে গল্প শুরু। এখানে রুগীর সাথে কথোপকথনকালে নিজেকে হিন্দুস্থানী সাজে রেখে ‘কিস্কিন্ধা ফেরৎ’ বলে অভিহিত করে এবং হনুমানের চরিত্রাদর্শের কথায় প্রভুর জন্য যে আত্মত্যাগের মাধ্যমে মেয়েদের মাথা নিচু করে প্রভুর দাসত্ব করার চিত্র স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন—

> ‘মেয়েদের জীবন মরণ প্রভুদের মর্জ্জির উপর নির্ভর করছে, এমন মর্জ্জি যে খুশি হলেই বিনা বাধায় মুণ্ডুপাত হচ্ছে দেখবেন।”[৫]

এইভাবে মানুষের স্লফ পরিস্কারের ছলে তিনি জানান—

> ‘এই পচা Slough গুলি—ওগুলি নির্ম্মভাবে টেনে ছিঁড়ে ফেলা ভিন্ন; বিষাক্ত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সুস্থ হবার আশা নেই।”[৬]

অর্থাৎ মনে শিক্ষার আলো না পৌঁছালে যে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে চলছে সমাজ তা থেকে মুক্তি নেই। এরপর ডাক্তারের বাড়ির ঝির কথা বলতে গিয়ে ভূণহত্যার বিষয় নজরে আসে। সেখানে ঝি স্বামীর ইচ্ছায় একাজ করে। এই ভূণ হত্যার বিষয়ে স্বামীর ভাবনা নিম্নরূপ—

> ‘যারা এ জগতে মহাপাপ করে মরে, তাদের আত্মা ঐরকমেই ভূণ অবস্থায় বারে বারে যাতায়াত করে সাজা পাবে না ত কি? এই উপায়েই ঐ হতভাগ্যদের উদ্ধারের পথ। তিনি কিছু অন্যায় করেননি।”[৭]

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার বলেন—

> ‘তাহলে আইনের বিচারে আপনার দেবত্বটা যাচাই হওয়া দরকার।”[৮]

এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরই শিক্ষিতের বিবেচনাশক্তির পরিচায়ক। বাল্যবিবাহের চিত্র পাওয়া যায় এক প্রসূতির প্রসঙ্গে। বারংবার সন্তান নষ্ট ঠেকাতে স্বতন্ত্রবাসের কথা জানালে পরিবারের লোকেরা অসম্মত হয়। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার উপলব্ধি করেছিলেন আমাদের সমাজ বিধবার ব্রহ্মচর্য পালন মানতে পারে অথচ বিয়ের বয়স-এর প্রসঙ্গে বয়স বাড়াতে নারাজ। অবশেষে এহেন আচরণে প্রসূতির মৃত্যুই হয়।

সবশেষে নিজের জীবনকাহিনী যখন রুগীর কাছে বলে সেখানে শিক্ষালাভে হয়রানির চিত্র দেখা যায়। অল্পবয়সে বাবা-মা মারা যাবার পর স্কুলের মিশনারি মেমকে দেখে জীবন কাটায় ও শিক্ষা লাভ করে। এইসময় তার নামে থাকা টাকার লোভে দূরসম্পর্কের লোক বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে হাজির সে ম্যামের মাধ্যমে আপত্তি জানালে মেমের নামে কুৎসা রটায়। এ ঝড় থামলে আত্মীয়-বন্ধুর আশ্রয়ে পড়াকালীন সে যখন বলে—

> ‘মহাপাতকীকেও এত শাস্তি লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি, লেখাপড়া শেখবার জন্য আমায় যত লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে।”[৯]

তখনি তাঁর দুর্দশা প্রকাশ পায়।

তবে শেষে হিন্দু বাড়িতে থাকাকালীন এক শিশুর সঙ্গে তার আত্মিক যোগ দেখা যায় এবং এ নিয়ে দ্বন্দ্ব হেতু সেই বাড়িও ছাড়তে হয়েছে। তবে অনেকদিন বাচ্চাটাকে না দেখায় একদিন দেখতে গিয়ে জানে সে অসুস্থ, ঘা হয়েছে উরুস্তম্ভে। তার পরিচর্যা করতে গিয়ে কষ্ট দেখে ঘায়ের পরিস্কার বন্ধ রাখে আপাতভাবে বাচ্চা ভাল থাকলেও

ওই একটু অবহেলাতেই বাচ্চার মৃত্যু হয়। সেদিন থেকেই কোনো স্লফ না রাখার শপথ নিয়েছিল সে।

এরপর 'বিজয়ার নমস্কার' গল্পটির শুরুতেই দেখতে পাব ব্যথা নামক চরিত্রের গৃহস্থালী সামলানোর চিত্র এবং বাড়ির চাকরদেরও হুকুম শোনার চিত্র। আসলে ব্যথা অন্নদাসত্বের পায়ে মাথা বিকিয়েছে। তার নিজের পথ দেখার ক্ষমতা নেই কারণ—

> 'বাংলা মুল্লুকের মেয়ের পক্ষে তাতেই জাতিনাশ অনিবার্য্য।''[১০]

এই বাক্য মেয়েদের গৃহবদ্ধ জীবনের ইঙ্গিতবাহী। ব্যথার জীবন যেহেতু অন্যের দানে স্থাপিত তাই লাথি ঝাঁটা খেয়ে চুপ করে থাকাই তার জন্য নিরাপদ।

তবে হঠাৎ এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা দ্বারে এসে ব্যথা দেবীর কথা জানতে চায় তারপর ব্যথাই তাকে নমস্কার জানিয়ে নিজের ঘরে বসায় এবং পরিচয় দেয়। তারপর ব্যস্ততা দেখে লেখার বিষয়ে জানতে চায়। সে কাজের ফাঁকে লেখে একথা জানায়। তারপর প্রৌঢ়া মহিলা আরও লেখা চেয়ে, পাঁচ টাকা দিয়ে চলে যান। এখানেও মেমের হাতে টাকা নেওয়ায় তার জাত গেছে বলে তাকে গঞ্জনা সইতে হয় এবং তাকে একঘরে করে দেওয়া হয়।

এরপর তার বিবাহিত জীবনের ভয়াবহ চিত্র পাই। ব্যথার মা এক বড় গৃহস্থ ঘরে কন্যা সম্প্রদান করে মারা যান। সংসারে দুই ভাই সকলেই মেজাজী, অসৎ ও সুরাপানে পটু। একদিন বস্ত্রের ব্যবসায় আগুন লাগলে জুয়াচুরির অপবাদে নালিশ হয়। এ নিয়ে তিনভাই আলোচনায় বসলে বচসা বাঁধে ও কাটাকাটি শুরু হয়। সেই ভয়ানক ক্যাঁচার বিষে ব্যথার স্বামীরও মৃত্যু হয়। পরে ভাসুর সব আত্মসাতের জন্য তাড়াবার পরিকল্পনা করে, এমনকি তার পাঁচ মাসের শিশুর ভুল চিকিৎসা করিয়ে প্রাণ সংহারও করে।

এমন সময় দূর সম্পর্কীয় পিসতুতো ভাই ওই গ্রামে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে এসব জানতে পেরে তাকে নিয়ে এলে ব্যথার ভাসুর তাকে দুশ্চরিত্রা বলে রটিয়ে তার সম্পত্তি ভোগ করে।

এই ভাইয়ের থেকে শিক্ষা লাভ, ভাইয়ের বিদেশে যাত্রা, সেই থেকে ভাইয়ের পিসিমার বাড়িতে আশ্রয় লাভের ইতিকথা শুরু। ওদিকে 'আনন্দ পত্রিকা'র অফিস থেকে ওই মেম ব্যথাকে লেখা চিঠির উত্তর না পেয়ে গিয়ে হাজির হন এবং দুর্দশাগ্রস্ত ব্যথাকে নিয়ে যান সাথে। তারপর বিজয়াতে আশীর্বাদ এবং ব্যথার নমস্কার প্রদানে—এ গল্প শেষ। এইভাবে লেখালিখি করতে যাতনা ও ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের চিত্র গল্পে দেখা যায়।

এরপর 'জন্ম-অভিশপ্তা' উপন্যাসেও শিক্ষিত ও চাকুরীরত নারীর নির্যাতনের চিত্র দেখা যায় গুরুমা চরিত্রকে কেন্দ্র করে। স্কুলের কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী ও সরযূ নামের এক ছাত্রী ও অন্যান্য ছাত্রীদের নিয়ে কাহিনী শুরু। স্কুলজীবনে সরযূ অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদের থেকে নতুন গুরুমার প্রতি একটা আলাদা অনুভূতি অনুভব করত। একদিন শ্রেণিকক্ষে ক্লাস চলাকালীন নতুন গুরুমার একটা চিঠি আসে। পাঠান্তে গুরুমা নিয়ে যেতে ভুলে যায় চিঠি তা সরযূ লক্ষ্য করে এবং কেউ যাতে চিঠি না পড়ে ফেলে তার আগেই নিজেই নিয়ে নেয় এবং গুরুমার বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসে। এমনি করে তাঁদের মধ্যে সহৃদয়তা তৈরি হয় এবং নতুন গুরুমার পুত্রদের (সুকু ও শান্তি) সহিত সরযূ মিশে যায়। এরপর স্কুলে ধেবুরানি নামে এক ছাত্রীর সঙ্গে মারপিঠ হয় অন্য ছাত্রীর। বিনা দোষে বান্ধবীরা বেত খায় প্রতিবাদ করতে গেলে সরযূকেও বকাবকি করে মেজ গুরুমা, সরযূ এ অবস্থায় রেগে বাইরে চলে যায়। সরযূর নতুন গুরুমা সেদিন সরযূকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেয়। অসুস্থ গুরুমার বিশ্রামের সময় সরযূ সেই চিঠি পড়ার লোভ সামলাতে না পেরে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে পড়ে নেয়। তখনি উঠে আসে নতুন গুরুমার করুণ জীবনবৃত্তান্ত।

সেখানে বারো বছর বয়সে বাবা মাকে হারিয়ে বিধবা মাসীর আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা, অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার চিত্র বিদ্যমান এবং কন্যাদায়গ্রস্ত মাসিমাকে উদ্ধার করা প্রসঙ্গে নতুন গুরুমার ভাবনা—

> 'তবে তিনি, ওই লোকটিও নন, ওর অভিভাবক ধনবান পিসেমশাই, পিসিমাও নন, সে হচ্ছে, মাসিমারই নিজের সিন্দুকের রূপসি রৌপ্যচক্র রাণী!''[১১]

এইভাবেই পণপ্রথার ইঙ্গিত গুরুমার ভাবনায় স্পষ্ট হয় এবং যার পরিণাম রচনায় ক্রমশ প্রকাশ পায়। শ্বশুর বাড়িতে সবার মন যুগিয়ে চলা ও নির্যাতন সহ্য করার ছবি দেখা যায়। স্বামীর অত্যাচারে প্রথম সন্তান নষ্ট হয়। এ সকল সহ্য করে ঈশ্বরের কাছে আত্মার উন্নতি প্রার্থনা করে। এত অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়েও পরে দুই সন্তানের জন্ম দেয় গুরুমা। এই শিশুরাই বাবার অবহেলায় বিনা চিকিৎসায় ভোগান্তির শিকার হয়। এভাবে নিপীড়ন সহ্য করে দুইসন্তান সঙ্গে নিয়ে গুরুমা বাড়ি ছেড়ে শিক্ষকতার কাজ নেয়। এখানেও নিস্তার নেই। টাকার লোভে স্বামী হানা দেয় বারবার এবং উগ্র মেজাজে যখন জানায়—

> 'জানো তুমি, আমি তোমার স্বামী, তোমার ওপর সকল রকম নৃশংস নির্যাতনের অধিকার আমার আছে।''[১২]

তখনি অত্যাচারী স্বামীর স্বরূপ স্পষ্ট হয়।

এরকমভাবে হঠাৎ একদিন টাকা দিতে নাকচ করলে সন্তানদের খুনের হুমকি দেয়। সেদিন সরযূ উপস্থিত। দেখে গুরুমার মাথা ফাটা অবস্থা, প্রতিবাদের জন্য এগিয়ে এলে আঘাতে সেও অজ্ঞান হয়ে যায়। হাসপাতালে বিকারগ্রস্ততা কাটিয়ে সরযূ জানতে পারে নতুন গুরুমার একটা হাত নেই ও গুরুমার ছোট ছেলেও আর নেই। এইরকম ভাবে শিক্ষিত নারীর ভয়াবহ দুর্ভোগের চিত্র পাওয়া যায় রচনায় যা অত্যন্ত মর্মান্তিক।

এছাড়াও শিক্ষার পাশাপাশি বৈষ্ণব ঠোরের প্রধান ব্যক্তির ধর্মের নামে ভণ্ডতার দৃশ্য দেখা যায় 'কার্যকারণ' গল্পে, এখানেও ভণ্ডতার ফল ভোগ করতে হয় নারীকে। সে চিত্রই বিষয় আলোচনার মাধ্যমে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। গল্পে দেখা যায় বৈবাহিক সূত্রে এক ব্রাহ্মণ তরুণীর বৈষ্ণবী হওয়ার দৃশ্য। তাঁর স্বামী বনমালী দাস বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়ে রজ পেয়ে সংসার ত্যাগ করে। তখন এই তরুণীর উপর বৈষ্ণব ধর্মের মূল (ঠোরের প্রধান) ব্রজদাস বাবাজীর নজর পড়ে। পথে তাকে একদিন সরাসরি জানতে চাইলেও বাবাজীকে সে প্রত্যাখ্যান করে। মেয়েটি বাড়ি বাড়ি জল বিতরণ করে পাওয়া টাকায় দিন যাপন করত। একদিন এক তৃষ্ণার্ত মুসলিম বৃদ্ধকে রোজার পর জলদান করলে সে তৃপ্ত হয়ে তাকে আশীর্বাদ করে চলে যান। এদিকে ব্রজদাস বাবাজী নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একদিন ঘাট থেকে মেয়েটিকে মুখ চেপে তুলে নিয়ে যায়। সাথে থাকা সন্তানের ক্রন্দন ও মেয়েটির অস্ফুট চিৎকার ঘাটের মাঝি শুনতে পায় এবং মেয়েটিকে রক্ষা করে কিন্তু মেয়েটি মারা যায়। সবশেষে ব্রজদাস বাবাজীর চেহারা সামনে এলে শাস্তি স্বরূপ আজীবন অনাথ ও বিধবাদের দায়িত্ব নিতে হয় তাকে। এইভাবে পাপের ক্ষয় ও পুণ্যের জয়, নারীর ভোগান্তি ও ধর্মের কেন্দ্রে থাকা মানুষের দুর্মতির চিত্র দেখা যায়।

এইরকম চিত্রের পাশাপাশি খুবই সাধারণ ছাদে বাঁধা মেয়েদের নিয়মমাফিক জীবনচর্যার ছবি পাই ননী খানসামার ছুটিযাপন গল্পে। গল্পে দেখা যায় মা, ভাই, স্ত্রী নিয়ে ননীর সংসার। সেখানে গ্রামীণ জীবনযাত্রা, বৌদিদির রসিকতা এবং মেয়েদের নিয়মমাফিক জীবনযাত্রা দেখা যায় পান দেওয়াকে কেন্দ্র করে গুরুজনের সামনে সরাসরি স্বামীকে পান না দিতে পারার দৃশ্যে।

এইরকম ভাবেই নারীর শিক্ষালাভে নানান বাধা ও সব বিপত্তি কাটিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ছবি যেমন পাই তেমনি দেখা যায় সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তির নারীর উপর করা অনাচারের প্রমাণ লোপাটের দৃশ্য। এছাড়াও নারীকে গৃহস্থালি সামলাতে, পণপ্রথার শিকার হতে, সমাজে ঘটে চলা অনিয়মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেও দেখা গেছে। এইভাবে শিক্ষা ও সমাজ সংক্রান্ত নিজস্ব উপলব্ধিকে ভাষা দান করে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে করেছেন সমৃদ্ধ, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রশংসিত।

তথ্যসূত্র

১. শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্পসংকলন, ২০০০, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৬৯।
২. তদেব, পৃ. ১৭০।
৩. তদেব, পৃ. ১৭২।
৪. তদেব, পৃ. ১৭৪।
৫. তদেব, পৃ. ৬৭।
৬. তদেব, পৃ. ৬৮।
৭. তদেব, পৃ. ৭০।
৮. তদেব, পৃ. ৭০।
৯. তদেব, পৃ. ৭৪।
১০. তদেব, পৃ. ৩৩।
১১. শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, আশ্বিন ১৩২৮, জন্ম অভিশপ্তা, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, পৃ. ৫৪।
১২. তদেব, পৃ. ১০৮।

রিঙ্কু রায়,
গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

নারী সমকামিতা ও ক্ষমতাতন্ত্র : প্রসঙ্গ দুটি বাংলা উপন্যাস

অসীম মণ্ডল

নারীবাদীচেতনা নারী স্বাধীনতার জন্ম দেয়, জন্ম দেয় নারী স্বাতন্ত্র্যবাদের। সামাজিক, অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে যেমন নারীর দৃপ্তকণ্ঠ সোচ্চার হয়, তেমনি সোচ্চার হয় যৌনতার ক্ষেত্রেও। এতকাল ধরে চলে আসা সংস্কার নীতির মূলে আঘাত করল নারীবাদী এই বোধ। প্রেম হোক মানুষে মানুষে। পুরুষে পুরুষে। নারীতে নারীতে। সে প্রেম হতে পারে প্রচলিত ধারা অনুযায়ী বিপরীত লিঙ্গের মানুষের সাথে, হতে পারে প্রচলিত ধারাকে অমান্য করে সমলিঙ্গেরই কোনো নারীর সাথে। তা কি শুধু মানসিক সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ থাকবে? না থাকবে না। কেননা শরীর বিনা প্রেম কিসে! প্লেটোনিক প্রেম সম্ভব নয়। এই প্লেটোনিক-এর অন্তরালে থাকে দেহজ আকর্ষণ। প্রেম থাক, যৌনবোধ থাক। 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' উপন্যাসে তিলোত্তমা মজুমদারের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়—

> "মানুষ ভাবে না, আমরা ভাবি না, যদি হয় হোক প্রেম নারীতে-নারীতে, পুরুষে-পুরুষে হোক। প্রেম হোক। প্রেমবোধ, দেহবোধ শুধুমাত্র। জন্ম দেবার তরে নয়। উৎপাদনের তরে নয়। যদি সৃষ্টি বলো, তবু সৃষ্টি হয়। আনন্দ। শিল্প। চিত্রকলা। পুরুষ নারীতে প্রেম সন্তানের সম্ভাবনা দিক। মানুষের সম্ভাবনা। ঘৃণাহীন, ঈর্ষাহীন, শত্রুভাবহীন অজস্র অসংখ্য প্রেমিক মানুষে ভরে যাক পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগ। ভালবাসো। ভালবাসো। ভালবাসি। এসো পরস্পর।"[১]

এই ভাবনাকে মাথায় রেখেই ১৯৯৯ সালের ২০শে জুন তৈরি হলো পূর্ব ভারতের প্রথম ও একমাত্র সমকামী, উভকামী ও রূপান্তরকামী নারীদের সহায়ক সংস্থা 'স্যাফো'। ১৯৯৯ সালে তৈরি কলকাতার স্যাফোর প্রথম মিটিং হয় মাত্র বাইশজন মেয়েকে নিয়ে। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে সদস্যসংখ্যা। স্যাফো দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে নারী, পুরুষ, সমকামী, বিষমকামী নির্বিশেষে সকল মানুষের দিকে যারা বিশ্বাস করেন যৌন পছন্দের অধিকার মানবাধিকারেরই একটি অংশবিশেষ। এই আদর্শকে সামনে রেখে ২০০৩ সালে তৈরি হয় 'স্যাফো ফর ইক্যুয়ালিটি', যৌনতার অধিকার আন্দোলনের মঞ্চ। ব্রাত্য হয়ে যাওয়া মানুষগুলো, প্রান্তিক হয়ে যাওয়া মানুষগুলো এখানে তাদের নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'গুরুচণ্ডালী' প্রকাশিত 'আমার যৌনতা' সংকলনে স্যাফোর একজন সদস্য সুনন্দা মুখোপাধ্যায় 'আমাদের কথা' প্রবন্ধে জানাচ্ছেন—

> "এক ছাতার তলায় অনেক মানুষের সমাহার। কেউ নিজের শরীর নিয়ে সন্তুষ্ট, কেউ নন। কেউ বদলে যেতে চান, কেউ নিজের চামড়ায় স্বচ্ছন্দ। এলিজিবিলিটি লড়াই মানেই কি শুধু যৌনতার অধিকারের লড়াই? না। নিজের মতো করে বাঁচবার লড়াই। আমার শরীর, আমার চিন্তা, আমার বেঁচে থাকার ধরণ যে আমারই, তার ওপর আর কারোর হাত নেই, না ধর্মের, না রাষ্ট্রের, না রাজনীতি, কারণ শেষ অবধি মানুষের জন্যই এই সবকিছু। আমার চাওয়ার উপরে কি করে তার অবস্থান হতে পারে?"[২]

নারী-নারী সম্পর্ক মানেই কি লেসবিয়ানিজম? দুটি শারীরিক নারীর মানসিক বা শারীরিক সম্পর্কে যদি একজন আগ্রাসী বা ডমিন্যান্ট, একজন ডমিনেটেড হয় সেই সম্পর্ককে কতটা লেসবিয়ান সম্পর্ক বলা যেতে পারে? নাকি সেটি আসলে প্রচলিত পিতৃতন্ত্রের নরম্যাটিভকেই স্বীকার করে নিয়ে হেটেরোসেক্সুয়ালিটির মধ্যেই পড়ে যায়। আসলে এই সম্পর্কে সমতা প্রয়োজন, প্রয়োজন সমানাধিকারের, পারস্পরিক ভালোবাসার। 'লেসবিয়ানিজম' একটা সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতি নির্মাণে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এখানে যে ডমিন্যান্ট রোল প্লে করে যাচ্ছে তাকে এবার ছাপিয়ে যাবার পালা। বাইরের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যেখানে তাকে কোনওভাবেই পুরুষের সমান হতে না দিয়ে অবদমনমূলক পীড়নের মাধ্যমে

মণ্ডল, অসীম : নারী সমকামিতা ও ক্ষমতাতন্ত্র : প্রসঙ্গ দুটি বাংলা উপন্যাস
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 2, Dec 2021, Page : 27-31, ISSN 2249-4332

তাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে তখন একটি মেয়েই হয়ে উঠতে পারে আরেকটি মেয়ের আশা ভরসার স্থল। এতদিন ধরে সে দেখে এসেছে সমাজ-রাষ্ট্র-পরিবার সমস্তই পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণাধীন। বর্তমানের নারী নারীবাদীচেতনায় ঋদ্ধ হয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে শুরু করেছে সমকাল, অতীত ও ভবিষ্যতকে। ফলে সনাতনী মূল্যবোধ ধ্বসে গিয়ে তৈরি হচ্ছে নবতর ইতিহাস। আজ একবিংশ শতকের নারী অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ তার 'সেক্সচুয়াল ওরিয়েন্টেশন' প্রকাশে। সে আজ ঘরে-বাইরে বিপ্লব করেও পছন্দের সঙ্গিনীর সাথে থাকবার মত সাহস দেখাতে পারছে—এটাই নারী স্বাধীনতা, এটাই নতুন যুগ। দুজন লেসবিয়ান নারীর মধ্যে সখ্য, নির্ভরতাও অনেক বেশি লক্ষ্য করা যায়। পুরুষের আগ্রাসী আধিপত্য বিলুপ্ত করতে চেয়ে একশ্রেণির নারীবাদীরা যৌনসঙ্গী হিসেবে কোনও পুরুষের পরিবর্তে নারীকেই নির্বাচন করতে চাইলেন। পুরুষের আধিপত্যের প্রকাশের চিহ্ন স্বরূপ পুরুষ লিঙ্গটিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নারী সমকামী স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে মত দিলেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বাস করেও অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত যৌনতার ক্ষেত্রেও নারী স্বাধীনতা ও নারী স্বাতন্ত্র্যতার প্রতিষ্ঠা উত্তর আধুনিক যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ক্ষমতাভোগী পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে গিয়ে এ আত্মপ্রকাশের লড়াইয়ের কথা উঠে আসবে উত্তর আধুনিক যুগের সাহিত্যে।

ক্ষমতা নিজেই একটা সত্তা। ফুকো বলেছেন, ক্ষমতা এমন একটা সত্তা যে সবার ওপর কর্তৃত্ব ফলায়। ক্ষমতার লক্ষ্য হল নানাভাবে প্রভাবিত করা। সেটাকেই কাজে লাগায় সমাজ এবং রাষ্ট্র। ক্ষমতা সর্বত্র। সমস্ত ক্ষেত্রে এর বর্ণময় উপস্থিতি লক্ষণীয়। ওপর থেকে একেবারে নীচ পর্যন্ত সব জায়গায় ক্ষমতার অস্তিত্ব বর্তমান। ক্ষমতা বহুমুখী ও সর্বত্র সঞ্চরমান। ফুকো যৌনতা নিয়ে ক্ষমতা-তত্ত্বের নতুন করে ব্যাখ্যা করেন। সমাজের মূলস্রোতের বাইরে সমকামিতা বর্তমানে পোস্টমর্ডানিজম সাহিত্যে এক বড় স্থান করে নিয়েছে। এখন সমকামিতার মতো বিভিন্ন প্রান্তিক বিষয়গুলো সমাজ-সাহিত্যের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠছে। যৌনতার ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতিটি ভঙ্গি পর্যন্ত পুরুষতান্ত্রিক। ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা পুরুষরাই ঠিক করে দেয় পদ্ধতি কি হবে।

তিলোত্তমা মজুমদার 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' উপন্যাসে বলছেন একসময় নারী বলতে বোঝানো হতো—

> "যখন, মেয়ে জন্মাত, আম-কুসি খেতে শিখবার আগেই কাঁসার থালায় বসে পড়ত, ঘুরত সাত পাক এবং দিন এগোলো, থালায় বিয়ে রইল না, তবে আটে নয়ে বিদায়। এগারোয় মানসিক পরিণতি এলো কি এলো না, তেরোয় মাতৃত্ব। তখন শুধু উৎপন্ন আর উৎপাদন। নারী মনুষ্য নয়। নারী এক গাভীর ন্যায় জাতি, যার সঙ্গে সম্পর্কিত, শুধুমাত্র উৎপাদন বৎস ও দুগ্ধ।"[৩]

কিন্তু আজ সময় বদলেছে, দিন পাল্টেছে। নারীরাও আজ শিক্ষাঙ্গনে, কর্মক্ষেত্রে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এই উপন্যাসের মূল চরিত্র শ্রুতি নিজেকে প্রস্তুত করবে বলেই আজ কলকাতার এক আবাসিকে। কিন্তু তার সেই আবাসিক জীবন অভিজ্ঞতা তার জীবনের মোড়কে উলটপালট করে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে দিয়েছে। উত্তর মধ্য কলকাতার একটি ছাত্রী আবাসকে কেন্দ্র করে কাহিনির জাল বোনা। সেই ছাত্রী আবাসের কুড়ি নম্বর ঘরে রুমমেট শ্রুতি, দেবরূপা ও শ্রেয়সী। এই তিনজনের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন, মনের বিভিন্ন স্তর উদ্‌ঘাটনের ক্রমিক পর্যায়ে প্রেম-ভালোবাসা-কামনা-সমকামনার কথা উপন্যাসকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। শ্রুতির শ্রেয়সীকে ভালো লাগে, সে শ্রেয়সীর প্রিয় বন্ধু হতে চায়, স্কুল জীবনে হারিয়ে যাওয়া শ্রেয়সীর প্রিয় বান্ধবী দময়ন্তী হয়ে উঠতে চায় সে। কিন্তু তা হয়নি কারণ দেবরূপা-শ্রেয়সীর আশ্চর্য আন্তরিক সম্পর্ক এ ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে সম্পর্ক অন্যান্য স্বাভাবিক সম্পর্কের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। যে সম্পর্কে একটি মেয়ে হয়ে উঠেছে আরেকটি মেয়ের আশ্রয়, ভালোবাসার আধার। সমাজ এ সম্পর্কের নাম দিয়েছে 'সমকাম', 'লেসবিয়ানিজম'। দেবরূপা আর শ্রেয়সীর মধ্যে আর সামান্যতম আর আড়ালও থাকছিল না, ওরা একটু একটু করে মিশে যাচ্ছিল। ওদের সহপাঠী দেবস্মিতা প্রথম শ্রুতিকে ওদের দুজনের সম্পর্কে বলেছিল—

> "আমি বলে রাখছি তোকে। ও লেসবিয়ান। ও তোদের সবকটাকে সিডিউস করে দেবে। তখন দেখিস আমার কথা সত্যি কিনা।"[৪]

শ্রুতি ডিকশনারির পাতা উল্টিয়ে 'লেসবিয়ান', 'সিডিউস' শব্দ দুটির অর্থ জেনে ছিল আর ঘৃণায় অস্থির হয়ে উঠে ছটফট

করেছিল। কেননা—

> ‘‘ও মাই গড্! হোমোসেক্সুয়াল, হোমোসেক্সুয়াল! দেবরূপা হোমোসেক্সুয়াল! শ্রুতি হোমোসেক্সুয়াল জানে। শ্রুতি হোমোসেক্সুয়াল ঘেন্না করে। শ্রুতি হোমোসেক্সুয়াল ভয় পায়!’’[৫]

শ্রুতি ভয় পায়, তার ঘেন্না লাগে, সে অস্থির হয়। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে আসার তার পক্ষে সম্ভব হয় না। শ্রুতি বিশ্বাস করতে চায়নি, বিশ্বাস করেনি। বরং তার মনে হয়েছিল হয়তো দুজনের বড় বেশি বন্ধুত্ব, তাই বলে হোমোসেক্সুয়াল একথা সে মনে ঠাঁই দিতে পারেনি—

> ‘‘অপরিসীম অন্ধকার থেকে ফিরবার ইচ্ছায় তার মনে হয়েছিল, আসলে পৃথিবীতে ততখানি ময়লা নেই যতখানি আছে বলে ভ্রম হয়। ময়লার পুরু স্তর মানুষের চিন্তনে।’’[৬]

হ্যাঁ, সমকামিতাকে শ্রুতি ময়লা বলেই মনে করে। অন্যান্য স্বাভাবিক প্রবণতার মতোই সমকামকে সে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারে না। জীবনের সঙ্গে যৌনজীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যেখানে যৌনতাও প্রকৃতির দান, সেখানে কোন বিভেদ বৈষম্য নেই। এ বোধে শ্রুতি উন্নীত হতে পারেনা অন্যান্য অনেকের মতই। দেবরূপা ও শ্রেয়সীর সমকামের সম্পর্ক একদিন সত্যিই সকলের সামনে প্রমাণ হয়ে যায়। সে নিজেও তাদের মিলনদৃশ্যের সাক্ষী হয়েছে। দেবরূপা ও শ্রেয়সীর এই সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে, বিরোধ করতে একদিন হোস্টেলের লাইব্রেরী ঘরে জমায়েত হয়েছে সব মেয়েরা। ওদের যৌন বিকৃতিমূলক ঘটনার বিবরণ দিয়ে মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি দিলে সেখান থেকেও এসেছেন প্রতিনিধি। আছেন হোস্টেল পাড়ার মহিলা সমিতির সদস্যরাও। যেন রীতিমতো আদালত বসেছে। সকলে সমস্বরে দেবরূপা ও শ্রেয়সীর যৌন বিকৃতির কথা বলে সরাসরি অভিযুক্ত করেছে ওদের। সকলের কাছে প্রমাণ স্বরূপ সাক্ষীও আছে হোস্টেলের মেয়েরা। আবার বর্ণা দেবরূপার লেখা ব্যক্তিগত চিঠি চুরি করে সকলের সামনে পড়েছে প্রমাণ দাখিলের দায়িত্ব-স্বরূপ। শ্রুতির বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে সব জেনেও চোখ বুজে থাকে, চুপ করে থাকে, ইচ্ছে করেই প্রতিবাদ করে না। সকলে সমস্বরে দেবরূপা ও শ্রেয়সীকে হোস্টেল থেকে তাড়িয়ে দেওয়াকে সমর্থন করেছে। আর শ্রুতি যদি কিছু প্রতিবাদ না করে তাহলে তাকেও হোস্টেল থেকে বের করে দেওয়া হবে। শিক্ষিত মানুষদের এহেন আচরণে শ্রুতি শিউরে উঠেছে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে শ্রেয়সী, দেবরূপার মুখ ফ্যাকাসে। সমাজের প্রভুত্বকামী শিক্ষিত মানুষদের এই নৃশংস ব্যবহার শ্রুতির মনে প্রশ্ন জাগিয়েছে, শ্রুতিকে বিধ্বস্ত করেছে। সকলে মিলে দেবরূপা ও শ্রেয়সীকে অপমানজনক ভাবে গণপ্রহার করে তাড়িয়েছে আর শ্রুতিকে তাড়িয়েছে ‘ভয়ার’ বা ‘দর্শকামী’ হিসাবে চিহ্নিত করে। শ্রুতি জানেনা সে নিজে ‘ভয়ার’ কিনা, তবু সমাজের এই প্রান্তিকরণের রাজনীতি তাকে সেদিন ভীষণভাবে আহত করে। সকলের সমস্বরের চিৎকার আজও শ্রুতির কানে বাজে, সমমনা মানুষদের কানে বাজে—

> ‘‘না, না, না। ওদের কেউ রুমে নেবে না। ওদের হস্টেল ছাড়তে হবে।’’[৭]

মানুষ নিজেদের মতো করে নিজেদের সুবিধামতো নিয়ম তৈরি করে, আইন তৈরি করে। যে নিয়মের বেড়াজালে ভেসে যায় সমকামিতার মত অনেক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই নিয়মের জন্য, প্রচলিত ধারণার জন্য অনেকে নিজেদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে প্রকাশ করার সাহস পর্যন্ত পায়না। কিন্তু প্রকৃতিতে এ ভেদ নেই, ভেদ নেই পশু সমাজ বা পক্ষী সমাজেও। লেখিকা জানাচ্ছেন—

> ‘‘প্রাকৃতিক নিয়মেই তারা বন্ধু হয়ে থাকে এবং এই বন্ধুত্ব যৌনতা পর্যন্ত। এরা পরস্পরকে টানে। সমলিঙ্গে টানে। বন তাদের পরিত্যাজ্য করেনি। অরণ্যে তৈরি হয়নি কোনও ভিন্নতর আইন। .... পশুত্বে সমস্ত স্বাভাবিক কিন্তু মনুষ্যত্বে নয়।’’[৮]

কেউ যেমন প্রকাশ করার সাহস পায় না নিজের প্রবৃত্তিকে আবার কেউবা খুঁজেই পায় না চিরজীবন ধরে নিজের প্রকৃত প্রবৃত্তিটাকে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শ্রুতিকে আমরা দেখি সেও শ্রেয়সীকে ভালোবাসে অন্যরকম ভাবেই। বাড়িতে ছুটিতে গেলে শ্রেয়সীর জন্য তার মন কেমন করে। শ্রেয়সীর একটুখানি সান্নিধ্য তাকে এক অনন্য ভালোলাগার, পূর্ণতার

অনুভূতি দেয়। কিন্তু সে হোমোসেক্সুয়াল ঘৃণা করে, ভয় পায়। অথচ শ্রেয়সীর প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণ তাকে সবসময় টানে। দেবরূপার সাথে শ্রেয়সীর অতিরিক্ত হৃদ্যতা তাকে কষ্ট দেয়, পীড়িত করে, ঈর্ষায় ভরিয়ে তোলে। উপন্যাসের শেষে দেখি শ্রুতি শেষ পর্যন্ত নিজের প্রবৃত্তিকে চিনতে পেরেছে। একদিন বন্ধ ঘরে নারীসুলভ কিশোর ললিতার সাথে দেবরূপাকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখতে পেয়েও কোন প্রতিবাদ করতে পারে না শ্রুতি, বাধা সৃষ্টিও করে না—

> ''আমরা বিস্ফারিত চোখে দেখছি। দেবরূপার শাড়ি উঠে গেছে কোমরে। পা ছড়ানো। ওর কোলে ললিতা। গায়ে শার্ট নেই। বুকে একটি কাপড় কাঁচুলির মত বাধা। তার ওপর দেবরূপার হাত খেলছে। দু'জনের মুখ একপাশে নামানো। এর ঠোঁট ওর ঠোঁটে ঢুকে আছে। কোনও হুঁশ নেই।''[১]

এ দৃশ্য তাকে ফেলে আসা স্মৃতির কথা মনে করায়। একটু একটু করে সব বুঝতে পারে শ্রুতি। নিজেকে পুরোপুরি চিনতে পারে। সে যে আসলে সমকামী সেই সত্যই এবারে তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই কোনও পুরুষের আহ্বানে নীরব শৈত্য প্রদর্শন করে এসেছে সে এতকাল। আর শ্রেয়সীকেও ভুলতে পারেনি এক মুহূর্তের জন্যও। দেবরূপা আর ললিতার সেই দৃশ্য দেখে সে আকাঙ্ক্ষা করেছে শ্রেয়সীকে ভীষণভাবে—

> ''আমার শ্রেয়সীকে মনে পড়ছে। কেন মনে পড়ছে। আমার তলপেট টনটন করছে। আমার শরীর জুড়ে আশ্চর্য অনুভূতি। আমার ওইরকম দেবরূপার মতো, কাঁচুলি ভেদ করতে ইচ্ছে করছে! আমার শ্রেয়সীকে মনে পড়ছে। হে ঈশ্বর, এর নাম যৌন অনুভূতি। হে ঈশ্বর, আমি ওদের ঘোর ভাঙিয়ে দিলাম না কেন? সে কি এইজন্যই যে আমি যা পারিনা, দেবরূপা যা পারে, তা প্রত্যক্ষ করে আমার সুখানুভূতি হচ্ছে।''[১০]

কেবল সমকামী সন্দেহে বা সমকামিতা প্রমাণিত হলে আজও মানুষকে অপমানিত, অপদস্থ হতে হয় পদে পদে। শুধুমাত্র তাই নয়, মানসিক ও শারীরিক ভাবে পীড়ন করতেও পিছপা হয় না পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এক ব্যাপক সংখ্যক মানুষ। আর তার ওপর যদি ওই সমকামীটি কোনও নারী হন, অর্থাৎ যদি লেসবিয়ান হন তাহলে তো অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায় বহুগুণ, কেননা সমাজ যে আজও পিতৃতান্ত্রিক, ক্ষমতার চূড়ায় যে আজও পুরুষ প্রতিনিধিরই আধিক্য। হিমাদ্রি কিশোর দাশগুপ্তের এইরকম মানুষদের নিয়ে লেখা উপন্যাস হল 'প্রেমসমকামী'। এই উপন্যাসে আছে অহনা, রুদ্রাণী, শ্যামলী ইত্যাদি চরিত্রগুলি যারা উল্লিখিত মানুষেরই প্রতিনিধি। আর এখানে আছে তাদের সংগ্রামের কথা, লড়াইয়ের কথা, হারের কথা, জিতের কথা।

উপন্যাসে দেখি কেন্দ্রিয় চরিত্র অহনা, সে উদীয়মান সাহিত্যিক, তার কাছে হঠাৎই এক নামী কাগজের কাছ থেকে টেলিফোন আসে সমকামিতা নিয়ে গল্প লেখার জন্য। অহনা ব্যক্তিগত ভাবে সমকামিতায় বিশ্বাস না করলেও উপন্যাস লেখার প্রয়োজনে খানিকটা সহানুভূতিশীল মন নিয়ে সে এ কাজে এগোয়। আর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আবশ্যিকভাবেই তাকে পরিচিত হতে হয় বেশকিছু সমকামী মানুষের সঙ্গে। এইরকমই একটি সমকামী গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য রুদ্রাণীর সাথে পরিচয় হয়, ক্রমে বন্ধুত্ব। কিন্তু ক্রমেই আমরা দেখতে পাই—আজও সমাজ সত্যিই খুব একটা এগোয়নি। আর এগোয়নি বলেই রুদ্রাণীর সাথে অহনাকে একসাথে দেখে লেসবিয়ান রুদ্রাণীকে চিনে ফেলে অহনার বান্ধনী মণিমালা লজ্জিত হয়, কুণ্ঠিত হয় স্বামীর সাথে পরিচয় করাতে। আজও সমাজের একটা বড় অংশের কাছে বিকল্প যৌনতায় অবস্থানকারী মানুষ খুব বেশিরকম অচ্ছুৎ, প্রান্তিক। এমনকি তাদের সাথে কথা বলা তো দূর অস্ত কোনও প্রকার সংশ্রবও রাখা যায় না। আজ সমকামিতা আইনসিদ্ধ অনেক লড়াইয়ের পরে। কিন্তু তারা কি সত্যিই আজও জিতেছে? যদি জিততো, তাহলে সমাজের উচ্চশিক্ষিত বলে পরিচিত মানুষেরাও সমকামিতা সম্পর্কে এরকম ধারনা পোষণ করেন কীসের ভিত্তিতে? রুদ্রাণীর প্রতি মণিমালার এহেন আচরণ আমাদের মনে ওই প্রশ্নগুলির জন্ম না দিয়ে পারে না।

আমরা উপন্যাসে আবার এই ধরনের আরও একটি অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। অহনার প্রেমিক নীল পেশায় একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের। কিন্তু সমকামিতা সম্পর্কে তারা এতটাই রক্ষণশীল মানসিকতার যে,

অহনার সমকামিতা বিষয়টি নিয়ে উপন্যাস লেখাও তাদের সংস্কার ও আভিজাত্যে আঘাত করে। নীল অহনাকে পরিষ্কার ভাবেই বলে—

> "না, এ বিষয় নিয়ে কোনো লেখা লিখবে না। আর লিখবে না আমাদের দু'জনের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই।"[১১]

ভাবতে আশ্চর্য লাগে এটা একবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ! আর নীলের মতো মানুষেরা শিক্ষিত রুচিশীল মানুষদের প্রতিনিধিস্থানীয়। সমকামিতা-বিষয়ক লেখা নিয়ে যাদের এরূপ রক্ষণশীল মানসিকতা, সমকামী মানুষগুলোর প্রতি তারা কোন মনোভাব পোষণ করতে পারেন না নিশ্চয়ই বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। তাই নারী সমকামী রুদ্রাণীর সাথে অহনার বন্ধুত্বের কথা জানতেই, কাগজে বিশেষ কারণবশত দুজনের ছবি একসাথে বেরোতেই অহনা-নীলের বহুদিনের প্রেমসম্পর্ক এক মুহূর্তে ভেঙে দেয় নীল। যে সম্পর্কের পরিণতি স্বরূপ বিবাহের কথা ছিল মাত্র কিছুদিন পরেই। কেবল সমকামিতা নিয়ে লেখা বেরোনোর বিজ্ঞাপন কাগজে দেখা কিংবা সমকামী মানুষের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন যদি সম্পর্ক ভাঙার, বিবাহ ভাঙার একমাত্র কারণ হয়—তাহলে আমাদের সত্যি ভাবতে হয় কোন্ সমাজে আমরা বাস করছি। যেখানে একজন মানুষ যিনি লেখিকা হয়তো লেখার প্রয়োজনেই সমকামী মানুষের সাথে মিশছেন বলে সমাজ তাকে ব্রাত্য করে—এ সমাজ তো আমরা চাইনি। তার চেয়ে সমাজের মূলস্রোতে না থেকে প্রান্তিক হয়ে থাকাই বোধহয় মানুষগুলোর পক্ষে অনেক বেশি সম্মানজনক। যতদিন না এ সমাজ তার মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, যতদিন না প্রাচীন রক্ষণশীল কুসংস্কারকে দূর করে দিচ্ছে, যতদিন না মানবতার জয় ঘোষিত হচ্ছে—ততদিন ওরা ব্রাত্যই থাক, প্রান্তজন হয়েই সুখে থাক; কেননা আজও সমাজ ওদের বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি, এই একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়েও না।

তথ্যসূত্র

১. তিলোত্তমা মজুমদার, 'চাঁদের গায়ে চাঁদ', আনন্দ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১২৪।

২. 'আমার যৌনতা', একটি গুরুচণ্ডালী সংকলন, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৮, সুনন্দা মুখোপাধ্যায়, আমাদের কথা' প্রবন্ধ, পৃ. ১২৫।

৩. তিলোত্তমা মজুমদার, 'চাঁদের গায়ে চাঁদ', আনন্দ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুলাই ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ২৩।

৪. তদেব, পৃ. ৮৫।

৫. তদেব, পৃ. ৮৬।

৬. তদেব, পৃ. ৮৭।

৭. তদেব, পৃ. ১৪২।

৮. তদেব, পৃ. ৮০।

৯. তদেব, পৃ. ২২৭।

১০. তদেব, পৃ. ২২৭-২২৮।

১১. হিমাদ্রি কিশোর দাশগুপ্ত, 'প্রেম সমকামী', প্রিয়া বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা-২০১৯, পৃ. ২৯-৩০।

অসীম মণ্ডল
পি এইচ ডি গবেষক,
বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

‘দ্বিতীয় ইনিংসের পর’ : বাংলা ক্রীড়াসাংবাদিকতায় মনান্তর ও খাতবদল

রাহুল পণ্ডা

মতি নন্দীর ‘দ্বিতীয় ইনিংসের পর’ উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালের জুন মাসে। ক্রীড়া-সাংবাদিকতার ধরন-ধারণ নিয়ে লেখা এই উপন্যাসটি বিভিন্ন কারণেই চমকপ্রদ, কিন্তু চমকের শুরুটি ছিল একদম গোড়ার উৎসর্গপত্রতে, যেখানে উল্লেখিত ছিল তিনটি অসম পঙ্‌ক্তি—

‘শ্রীমান গৌতম ভট্টাচার্যকে,
যে শ্রীলঙ্কা ও শারজায়
ভারতীয় ক্রিকেটারদের কাছের থেকে দেখেছে।’[1]

আপাতদৃষ্টিতে এই উৎসর্গের মধ্যে গোল নেই কোথাও। প্রবীণ ক্রীড়াসাংবাদিক, যিনি কিনা কিংবদন্তী সাহিত্যিকও বটে, তিনি নিজের অনুজ এক ক্রীড়া সাংবাদিককে, যে সদ্যই বছর খানেক সাংবাদিকতা শুরু করেছে, নিজের সদ্য প্রকাশিত বইটি, যার বিষয়বস্তুও ক্রীড়া-সাংবাদিকতা, তা স্নেহবশত উৎসর্গ করছেন। কিন্তু বাংলা ক্রীড়া-সাংবাদিকতার দলিল-দস্তাবেজের খোঁজ যাঁরা রাখেন, তাঁরা বুঝবেন কী অপরিসীম শ্লেষই না লুকিয়ে ছিল তিন কলামের এই উৎসর্গপত্রের মধ্যে। এই শ্লেষের প্রেক্ষাপটটি বুঝতে হলে আমাদের খানিক নেড়ে-ঘেঁটে দেখতে হবে বাংলা ক্রীড়া সাংবাদিকতার ইতিহাস।

আপাতত সাল ২০২২। সকালবেলা যে কোনো বাংলা সংবাদপত্রের পাতা ওল্টালে দেখা যায় অন্তত দু’পাতা খেলার জন্য বরাদ্দ। কারও কারও তিনপাতা, বিশ্বকাপের মতো জমজমাট ইভেন্ট হলে চার-পাঁচ পাতা পর্যন্ত। রাজনীতির পরেই সাংবাদিকতার জগতে সবচেয়ে প্রশস্ত এবং বিস্তৃত ক্ষেত্রটি হল ক্রীড়াজগৎ।

কিন্তু বেশ কয়েক দশক পিছিয়ে গেলে খেলা নিয়ে আজকের উন্মাদনার ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল পত্রিকার পাতায়। নিউজপ্রিন্টের সিংহভাগ তখনও আজকের মতোই বরাদ্দ থাকত রাজনীতির জন্য, তারপরে আসত বিজ্ঞাপন, অবশিষ্ট জায়গাটুকুতে অন্যান্য খবর, শেষে স্বল্পতম জায়গাটিতে দু’কলম খেলার কথা। আর সে জমির মাপ এতই নগণ্য যে সেখানে শ্যাম-কুল কোনটাই ধরে না, একচালা বাড়ি তোলার পর, প্রাতঃকৃত্যের জন্য পড়শির চৌকাঠে হাজিরা দিতে হয়।[2] বস্তুত খেলা নিয়ে পেপারে কোনো জায়গাই থাকত না তখন। ছাপান্ন সালে কে ডি যাদবের অলিম্পিক মেডেল জেতার খবর পত্রিকার পাতায় কীভাবে লেখা হয়েছিল, তার একটি অকাট্য আন্দাজ মতি নন্দী দিয়েছেন ‘নারাণ’ উপন্যাসে—

> ‘ভারতীয় ব্যান্টমওয়েট মল্লবীর কে ডি যাদব ফ্রিস্টাইলে কুস্তি যুদ্ধে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ব ওলিম্পিকের ব্রোঞ্জ পদক লাভ করিয়াছেন। কে ডি যাদব সর্বপ্রথম ভারতীয় যিনি বিশ্ব অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত হইলেন। যাদব শেষ লড়াইতে পরাজিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন রাউণ্ডের লড়াইতে তিনি ত্রুটিহীন মল্লযুদ্ধের অবতারণা করায় পদক লাভ করিয়াছেন।”[3]

এটুকুই। আজকের দিনে কেউ অলিম্পিকে মেডেল পেলে তার খবর নিপাট তিন-চারটি বাক্যে সেরে দেওয়া হচ্ছে, এহেন ধৃষ্ট কল্পনা ঘুণাক্ষরেও সম্ভব নয়।

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে, ভারতীয় ক্রিকেট দল নিয়মিত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যাতায়াত শুরু করার পর থেকে খেলা নিয়ে খানিকটা খবরাখবর পত্রিকাগুলি দেওয়া শুরু করে। যদিও সে খবরের মান, বা লেখার গদ্যরস

পণ্ডা, রাহুল : ‘দ্বিতীয় ইনিংসের পর’ : বাংলা ক্রীড়াসাংবাদিকতায় মনান্তর ও খাতবদল
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 2, Dec 2021, Page : 32-40, ISSN 2249-4332

বিশেষ উচ্চমানের ছিল এমন নয়। ষাট-সত্তরের দশকে এসে পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করে। ছয়ের দশকে ক্রিকেট-ফুটবলের মতো জনপ্রিয় খেলাগুলোয় ভারত ক্রমশ আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য পেতে শুরু করলে, এবং ময়দানি ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান এই দু'টি ক্লাব অজস্র সমর্থকের আবেগ-আকাঙ্ক্ষার আশ্রয় হয়ে উঠলে, খেলার খবর নিয়ে চাহিদা তৈরি হতে থাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ফলে সংবাদপত্রগুলোও এই চাহিদাগত চিদবৃত্তি পূরণের উদ্দেশ্যে ক্রীড়া সাংবাদিকতার জন্য স্বতন্ত্র পরিসর ধার্য করতে থাকে। বিভিন্ন ধরনের খেলার খবর, ম্যাচ রিপোর্টিং, সাক্ষাৎকার, বিশেষজ্ঞের মতামত ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। পাঠকদের মধ্যেও বিবিধ পাঠ প্রতিক্রিয়া, নিয়মিত খেলার খবর রাখা, নিজস্ব মতামত তৈরির ঝোঁক ইত্যাদি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আনন্দবাজার পত্রিকায় মুকুল দত্ত এবং মতি নন্দী, যুগান্তর পত্রিকায় অজয় বসু, শনিবারের রম্যগদ্যের তালিকায় শঙ্করীপ্রসাদ বসু প্রমুখ ক্রীড়া লিখিয়েরা নিজেদের ক্ষেত্রটিকে ক্রমশ মজবুত করে তোলার দিকে সচেষ্ট হন।

এতদ্‌সত্ত্বেও খেলা নিয়ে সংবাদপত্রগুলিতে একধরনের অন্ত্যজ জল-অচল ভেদ ছিলই। বহু সম্পাদকই খেলাকে গণ্য করতেন না সাংবাদিকতার উচ্চকোটিতে। সত্তরের দশকে আনন্দবাজারের তৎকালীন ক্রীড়া সাংবাদিক জানাচ্ছেন—

> 'এক শনিবার বিকেলে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল বড় ম্যাচ। মাঠ থেকে অফিসে ফিরেছি। ম্যাচ রিপোর্ট করার দায়িত্ব সে-দিন আমার। সম্পাদক বললেন, ''ঠিক দু'শো শব্দ লিখবে। তার বেশি একটাও নয়। একেবারে জায়গা নেই।''
>
> দু-একদিন নয়। দিনের পর দিন এ-রকম হত। ময়দানে বিস্তর ঘোরাঘুরি করে প্রচুর খবর, প্রচুর ঘটনার কথা জেনেছি, অথচ লেখার জন্য কাগজে তেমন জায়গা নেই।''[৫]

আশির দশকের গোড়াতেও দেখা যাচ্ছে মানসিকতার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। 'আজকাল' পত্রিকার দাপুটে ক্রীড়া সাংবাদিক অশোক দাশগুপ্ত লিখেছেন কীভাবে পত্রিকার সম্পাদক গৌরকিশোর ঘোষ নিয়মিত খেলার নিউজপ্রিন্ট নিয়ে বাগড়া দিয়ে যেতেন তখন—

> 'গৌরকিশোর ঘোষের সঙ্গে কাজ করার সময় আমাদের ভালো লেগেছে, কিন্তু লড়াইও করতে হয়েছে প্রচুর। কোনও খেলার খবর প্রথম পাতায় আনার জন্য অথবা বেশি জায়গা পাওয়ার জন্য আমাদের অনেক আগে থেকে প্রস্তুতি নিতে হত। তাতেও যে সবসময় ভালো ফল হত, তা অবশ্য নয়।
>
> একবার মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ নিয়ে আজকালে চার-পাঁচটি লেখা থাকার কথা। স্পোর্টস-এর ঘরে সরোজ, ধীমানরা লেখা তৈরিতে ব্যস্ত। আমি আর সুরজিৎ ম্যাচ রিপোর্ট লিখছি অন্য একটা ঘরে। হঠাৎ গৌরদা এসে বললেন, 'কাল রবিবার অশোক, প্রচুর বিজ্ঞাপন, তোমাদের পাতায় অনেক বিজ্ঞাপন দিতে হবে, এমনিতে মেলা পলিটিক্যাল নিউজ আছে, শুধু মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল করলেই তো আর হবে না। খেলা নিয়ে দুটোর বেশি লেখা যাবে না ....।'[৬]

বোঝাই যাচ্ছে দৈনিক পত্রিকায় তখন খেলা নিয়ে লেখার চর্চা বা পরিবেশ ছিল না। অবশিষ্ট পেপারের নিরিখে খেলার অংশটিকে ক্রমাগত অন্তেবাসী, প্রান্তিক করে রাখা হচ্ছিল।

এই ছুঁৎমার্গ কেটে গেল নয়ের দশকে এসে। খোলা বাজার এবং অর্থনীতির উদারীকরণের সুযোগ নিয়ে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ হল খেলার ময়দানে। ইউরোপের নিরিখে ফুটবল, যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বাস্কেটবল এবং উপমহাদেশের সাপেক্ষে ক্রিকেট; দুয়ার খুলে দিল অফুরন্ত বাণিজ্যের। ১৯৮৩-র বিশ্বকাপ জেতার পরেই সাধারণ জনমানসে ভারতীয় ক্রিকেটাররা পূজিত হতে শুরু করেছিলেন প্রায় দৈব অভিঘাতে। সেই আইকন হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের রূপ নিল নয়ের দশকে। স্বভাবতই অর্থ যেখানে, বিজ্ঞাপন এবং প্রচারের আলোও সেখানে। ফলে ক্রীড়া সাংবাদিকতার জৌলুস পূর্বতন সময়ের নিরিখে বহুলাংশে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। পত্রিকার প্রথম পাতার বামনাইতে ভাগ বসালো শেষ পাতার খেলালোর খবর। এইভাবেই ধাপে ধাপে বাংলা ক্রীড়া সাংবাদিকতা জমি কেড়েছে, ঘর তুলেছে, উজ্জ্বল

সম্ভাবনা মজুত করেছে উত্তর প্রজন্মের জন্য।

এ তো গেল ইতিহাসের প্রেক্ষাপট। এখন প্রশ্ন হল এই যে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিতার ইতিহাস, এখানে লেখার ক্ষেত্রে কী ধরনের বিবর্তন দেখা যাচ্ছিল? লেখার বিষয়গত এবং শৈলীগত চিহ্নগুলি কীভাবে পালটেছে সময়ের সঙ্গে?

মতি নন্দী যে সময়ে সাংবাদিকতা করেছেন, অর্থাৎ ষাট ও সত্তরের দশকের উত্তপ্ত দিনগুলিতে, সে সময় ঘরে ঘরে টিভি ছিল না। রেডিও ছিল, কিন্তু সেও তো কেবল শোনা। মাঠে গিয়ে নিয়মিত খেলা দেখার অভ্যেস বা সুযোগও ছিল অপ্রতুল। বিশেষত কলকাতা থেকে দূরবর্তী মফস্বল এবং জেলা শহরগুলিতে খেলাকে বুঝে নেওয়ার একমাত্র সাঁকো হয়ে দাঁড়িয়েছিল সংবাদপত্র। আবার সংবাদপত্রে খেলার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জনে। ফলে খেলার টেকনিক্যাল আলোচনা, বল ধরে ধরে সূক্ষ্ম বিবরণ, মাঠের জমাট পরিবেশ, খেলোয়াড়দের ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বিবিধ ক্রীড়া আচার তখন জায়গা পেত খেলার পাতায়। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, মুকুল দত্ত, বেরী সর্বাধিকারী, অজয় বসু এবং সর্বোপরি মতি নন্দী; কমবেশি সমস্ত কলমচি এই ঘরানাতেই লিখেছেন সে সময়।

কিন্তু আশির দশক থেকে পরিস্থিতি পালটাতে শুরু করলো। টিভি এলো। সেই বোকাবাক্সের পর্দায় ভেসে উঠলেন ঝাঁকে ঝাঁকে ধারাভাষ্যকার। খেলার বিরতিতে ক্লিপিংস দেখিয়ে নিখুঁত কাটাছেঁড়া চলল। খেলার আগে এবং পরে কোট-প্যান্ট পরিহিত বিশ্লেষককুল বুঝিয়ে বললেন যাবতীয় হালহকিকত। যে জিনিস পরের দিন সংবাদপত্র পড়ে বুঝতে হচ্ছিল, তা টিভির পর্দায় টাটকা অডিও-ভিস্যুয়াল দৃশ্যায়নে দর্শকদের সামনে আগাগোড়া উপস্থাপিত হল।

এই পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রের করণীয় কী? পত্রিকায় যা থাকার, যা বলার, তা আদ্যোপান্ত চলে গেছে টিভির গর্ভে। শুধু তাই নয়, ক্রীড়াবিদদের প্রতি মুহূর্তের হালচালও দেখে নেওয়া যাচ্ছে সেখানে। নিয়মিত প্রচার হচ্ছে সাক্ষাৎকার, টিম নিউজ। স্বভাবতই পত্রিকাগুলি সরে গেল, সরে যেতে বাধ্য হল আরও বেশি গহীন অন্ধকারে, যে আঁধারের খবর টিভির ব্যুম রাখে না। তারা ঢুকে পড়তে চেষ্টা করলো ক্রীড়াবিদদের ব্যক্তিগত জীবনে, ড্রেসিংরুমের মন কষাকষিতে, রগরগে নিশাভিসারে। খেলোয়াড়রা কেবল আর মাঠের মধ্যে পারফরম্যান্সের জন্য খবর হলেন না, মাঠের বাইরের খবরেও ক্রমশ শিরোনামে আসতে শুরু করলেন। যেভাবে একজন সিনেমার নায়ক বা নায়িকা পেজ থ্রির চিত্র সাংবাদিকদের দ্বারা নিয়ত অনুসৃত হন, ঠিক সেভাবে ক্রীড়াবিদ্‌রাও অনুসৃত হতে শুরু করলেন। খেলার টেকনিক্যাল আলোচনা কমলো, কমলো বিশ্লেষণাত্মক দিক, বাড়লো বিতর্ক। সেই সমস্ত সাংবাদিকের কদর বাড়লো, যাঁদের খেলোয়াড়দের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ নিবিড়। যাঁরা খেলার লেখার বদলে, 'স্টোরি' তৈরি করতে পারেন। বাংলা ভাষায় 'আজকাল' পত্রিকাগোষ্ঠী অশোক দাশগুপ্তের নেতৃত্বে এই কাজ প্রথম সাফল্যের সঙ্গে করে দেখায়। পরবর্তীকালে ঝাঁকের কইয়ের মতো 'আজকাল'-কে অনুসরণ করে অন্যান্য সংবাদপত্রগুলিও।

সাংবাদিকতার এই বাঁকবদল মতি নন্দীর মতো সাবেক লোকজনের পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত ছিল। মতি নন্দী মানেনওনি। খেলা এবং ফিল্মি গসিপ যে এক নয়, এই বিশ্বাসে তিনি থিতু ছিলেন আজীবন। আর সেই সংবেদনারই ফসল হল 'দ্বিতীয় ইনিংসের পর'।

এই উপন্যাসে আমরা দুটি চরিত্রকে বিশেষভাবে দেখতে পাই—সরোজ এবং শঙ্কর। দু'জনেই পেশায় ক্রীড়া সাংবাদিক। সরোজ এককালের রঞ্জি ক্রিকেটার, পরবর্তীতে বর্ষীয়ান ক্রীড়া সাংবাদিক। ক্রিকেটটা সে বোঝে টেকনিক্যাল লাইনে। কোনো ক্রিকেটারের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত আলাপ নেই, ড্রেসিংরুম স্টোরি নিয়েও তার আগ্রহ নেই। সে কারণে যথেষ্ট মুচমুচে খবর নিয়মিত পরিবেশন করতে সরোজ অপারগ। পত্রিকার ক্রীড়াসম্পাদক রমেন গুহঠাকুরতা তা নিয়ে যথেষ্টই খাপ্পা। সরোজের প্রাচীনপন্থী ক্রীড়াভাষ্য যে এযুগে চলে না, তা তিনি প্রায়শই বুঝিয়ে দেন। সরোজ সম্পর্কে ভেসে বেড়ায় তাঁর সহজ পর্যবেক্ষণ—

> ‘মান্ধাতাপন্থী .... নীতিবাগিশ .... আধুনিক রিপোর্টের কিসসু জানে না।’[৬]

তিনি এও মনে করেন, নেহাত ভেটারেন তাই, বর্তমানে হলে সরোজ চাকরিটা পেত না—

> ‘তখন কাগজের যা চরিত্র ছিল আর এখন .... দুনিয়াটা যেভাবে র‍্যাপিড বদলে গেছে তার সঙ্গে কাগজও বদলাতে বাধ্য। জার্নালিজম্ যেখানে এসেছে তাতে ও এখন হলে চাকরিই পেত না। .... টোটালি মিসফিট।’[৭]

তবু সরোজ নিজের বিশ্বাস এবং চালে অনড়। নমস্য ক্রীড়াসাংবাদিক নেভিল কার্ডাসের মতো প্রাচীন ভাষাশিল্প এবং খেলার টেকনিক্যাল বিশ্লেষণেই সে মনোযোগী। সরোজের সাফ বক্তব্য—

> ‘খেলোয়াড়রা শ্রদ্ধা পাবে মাঠের মধ্যে তাদের কাজকর্মের গুণে। মচমচে তেলেভাজার মতো তাদের মাঠের বাইরের কীর্তিকলাপগুলোকে খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিনে সাজিয়ে খদ্দের ধরার যেন একটা হুজুগ এসে গেছে। এসব তার দ্বারা হবে না।’[৮]

কারণ—

> ‘পাঠকদের মনের মধ্যে সুপ্ত নীচ প্রবৃত্তি খুঁচিয়ে তুলে একটা নোংরা আবহাওয়া তৈরি করে পাঠক সংগ্রহ করার, কাগজের বিক্রি বাড়ানোর এই পন্থা মেনে নেওয়া যায় না।’[৯]

তাই সরোজ এই প্রজ্ঞায় স্থির এখনও যে—

> ‘খেলার মাঠে খেলা হচ্ছে, তুমি দেখছ, খেলার দোষ ত্রুটি, ভালমন্দ যা বুঝলে সেটাই তোমার রিপোর্ট করার বিষয়।’[১০]

সরোজের ঠিক উলটো কোটিতে অবস্থান শঙ্কর ওরফে শঙ্কুর। শঙ্করের বয়স অল্প। সে কোনোদিন ক্রিকেট খেলেনি, ক্রিকেট বিশেষ বোঝে এমনও নয়। ক্রিকেট তার কাছে গসিপ। তাই চিরাচরিত ম্যাচ রিপোর্টের দিকে তার ঝোঁক কম। বেশি আগ্রহ ড্রেসিংরুম স্টোরির দিকে। সরোজকে প্রথম সাক্ষাতেই সে জানায়—

> ‘.... আমি তো ঠিক ম্যাচ রিপোর্ট করব না, সাইড লাইটস, ড্রেসিংরুম রিজের ওপরই বেশি জোর দেব, গসিপ কলামে যেমন বেরোয়, আর ইন্টারভিউ এইসব ....।’[১১]

সে এসেছে ঝগড়াঝাটি, রসালো কথাবার্তা, অপ্রীতিকর ঘটনা অর্থাৎ কেচ্ছা জোগাড় করার জন্য। খেলার সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগাযোগ না থাকলেও এইসব খবর সে করবে, কারণ এই ধাঁচের তরল লেখাই পাঠক ইদানিং উপভোগ করে তারিয়ে তারিয়ে। তুলনামূলক কঠিন এবং পরিশ্রমী বিশ্লেষণ পড়ার দিকে পাঠকের প্রবৃত্তি বা রুচি কোনোটাই নেই।

স্বভাবতই এই দুটি সাংবাদিক চরিত্র, আসলে দুই প্রজন্মের ক্রীড়া সাংবাদিকতার তফাত। পালটে যাওয়া সময়ের দুই মেরুতে, দুটি আলাদা ন্যায়দর্শনে সরোজ এবং শঙ্কর দাঁড়িয়ে। আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না মতি নন্দীর পক্ষপাত সরোজের দিকেই। সরোজ তো কাল্পনিক কেউ নয়, মতি নন্দী স্বয়ং। যে মতি নন্দী সত্তরের দশকে দাপটের সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রীড়াসম্পাদনার দায়িত্ব সামলেছেন, যাঁর এক একটি রিপোর্টিং পড়ার আগ্রহে অধীর থেকেছে বাংলার তামাম পাঠককুল, অথচ যে মতি নন্দী আশির দশকে এসে আর তাল মেলাতে পারছেন না খেলার জগতের সালতামামিতে, ফলত তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ক্রীড়াসম্পাদকের কুর্সি থেকে, সেই অভিযাত্রার বিবরণ সরোজের মধ্যে সোচ্চার করেছেন তিনি। অন্যদিকে শঙ্কর আধুনিক ক্রীড়াসাংবাদিককুলের প্রতিনিধি, (বিশেষভাবে গৌতম ভট্টাচার্য), যাদের অবস্থান, ভাবনা, রিপোর্টিং কোনোকিছুই পছন্দ নয় মতি নন্দীর।

লেখার মধ্যেও সেই অসন্তোষ গোপন থাকেনি। শঙ্করকে দেখা মাত্র সরোজের অবচেতনে 'বিতৃষ্ণা' ঘনিয়ে উঠেছে।[১২] বিতৃষ্ণা শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। মতি নন্দী তাঁর উত্তর প্রজন্মের দিকে তীব্র বীতরাগে যেন শব্দটি ছুঁড়ে দিয়েছেন। এই প্রজন্ম ক্রিকেট বোঝে না, অথচ তা নিয়ে তাদের কোনো জড়তা বা কুণ্ঠা নেই। তারা অক্লেশে, শঙ্কর

যেমন লেখে, ক্রিকেটারদের রাত্রিজীবন নিয়ে লিখতে পারে, টেনে আনতে পারে ড্রেসিংরুমে হাতাহাতির গল্প, নিঃসংকোচে চারিয়ে দিতে পারে অর্ধসত্য গুজব। আমরা এতক্ষণে বুঝতে পারি উৎসর্গপত্রের নিহিত ব্যঙ্গটি, যেখানে আলগোছে মতি নন্দী লিখে দিয়েছেন—

.... ক্রিকেটারদের কাছের থেকে দেখেছে।'[১৩]

এই 'কাছ থেকে দেখা'র দ্যোতনা উপন্যাস জুড়ে শঙ্করের রিপোর্টিং-এর মধ্যে ছড়িয়ে। আমরা যদি উত্তর প্রজন্মের দু'একজন ক্রীড়া সাংবাদিকদের দৃষ্টান্তমূলক কিছু রিপোর্টিং খেয়াল করি, মতি নন্দীর অভিযোগের সারবত্তাটা খানিক উপলব্ধি করতে পারব।

একদা 'আনন্দবাজার', আপাতত 'এই সময়' পত্রিকার সাংবাদিক সব্যসাচী সরকারের অত্যন্ত পরিচিত একটি বই 'সবার শচীন আমাদের সৌরভ'-এর কথা প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে। বইটির ভূমিকায় লেখক দাবি করেন তিনি 'শচীন-সৌরভের জীবনী বা বাইশ গজে তাঁদের ছড়ি ঘোরানোর ইতিহাস লিখতে' চাননি। বরং—'চারদিক থেকে ঢেউয়ের মতো ধেয়ে আসা চাপ সামলেও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার' যে 'লড়াইটা শরীর মন দুটোই নিংড়ে নিচ্ছে আধুনিক ক্রীড়াবিদদের, শারীরিক ও মানসিক ক্ষয়ের এই যে প্রক্রিয়া, ... শৈশব-কৈশোর-যৌবনকে বন্ধক রেখে যে লড়াইটা আজকের চ্যাম্পিয়নদের করতে হচ্ছে ....' সেটাই 'হবু শচীন সৌরভদের' বোঝানোর জন্য তিনি কলম ধরেছেন।[১৪] বই খুললে সেইসব নাছোড় লড়াইয়ের বিচিত্র সব নমুনা পাওয়া যায়। যেমন সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা হলেই শচীন খবর নেন ধূমপানের অভ্যাস ছেড়েছেন কিনা।[১৫] অথবা সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতাতেও শচীন বাস্কেটবলটা মার্কিনদের তুলনায় ভালো খেলেন।[১৬] বা লিটল মাস্টার কদাপি মদ্যপান করেন না তবে শৌখিন ফরাসি ওয়াইন হলে চেখে দেখতে পারেন।[১৭] উলটো দিকে সৌরভের মানসিক জোরের নমুনাও প্রচুর। যেমন ভারতীয় টিমে সুযোগ পেতেই সৌরভের টেলিফোনে অগুনতি যুবতীর ফোন আসতেই থাকে, কিন্তু তিনি বিবাহিত, স্ত্রী-অন্ত প্রাণ এবং চরিত্রে পোক্ত, তাই ধনকুবের কন্যাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চলেন ইত্যাদি।[১৮]

সব্যসাচীবাবুরই আরেক বই 'লর্ডস থেকে টনটন'-এ যেমন ফলাও করে সৌরভের বিয়ের খবর জানানো হয়েছিল। কীভাবে বিয়ের খবরটা প্রথমে চেপে রাখা হয়, বিভিন্ন পেপারের সাংবাদিকরা খবরটি যোগাড় করতে কেমন মরিয়া ছিলেন, তারপরে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে কীভাবে মারকাটারি নিউজ স্কুপখানি উদ্ধার করা গেল ইত্যাদি ছিল বইটিতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে।[১৯] অথচ মূল লেখাটি ধারাবাহিক আকারে প্রকাশিত হয়েছিল কিশোর পাঠ্য ম্যাগাজিন 'আনন্দমেলা'য়। এইসব খবরে হবু শচীন-সৌরভদের কতখানি মানসিক দৃঢ়তা তৈরি হয় তা গবেষণার বিষয়, তবে ক্রীড়া সাংবাদিকতার অভিমুখটি বোঝা যায় বেশ স্পষ্টভাবে।

সব্যসাচীর এক ধাপ উপরে গৌতম ভট্টাচার্য। তিনি আরও একটু উঁচুদরের সাহিত্যিক, তাই খেলা নিয়ে লেখালেখিটাকে ড্রেসিংরুম স্টোরির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে, প্রায় গোয়েন্দা গল্পের জায়গায় নিয়ে গেছেন। তাঁর বইপত্রের নামগুলি যেমন ('সিলি পয়েন্ট থেকে', 'ব্যাটে যাদের আগুন জ্বলে', 'ক্রিকেট শ্যাম্পেনের দুর্ভিক্ষে', 'দিগভ্রষ্ট রাজপুত্র', 'বডিলাইনের যুদ্ধে', 'নতুন বলের মুখে', 'স্টিভের অস্তরাগে' ইত্যাদি), তেমনই তাদের পাতায় পাতায় রোমাঞ্চ। সঙ্গে চমকপ্রদ ঘটনার ভিড়, নিত্যনতুন চরিত্র আর কল্পনার অপরিমিত মিশেল। বাড়তি মশলার হদিস দিতে গৌতমবাবু প্রত্যেকবারই বই লেখার সময় সাজিয়ে নেন কিছু প্রশ্ন, বইয়ের মলাটেই যত্ন করে লেখা থাকে সেগুলি, যেমন—

প্রথমবার বেটিংয়ে নেমে আজহার কেন ব্যর্থ হয়েছিলেন? চন্দ্রচুড়ের সামনে সচিন কি মিথ্যে সাক্ষ্য দেন? সৌরভের উপর ইয়ান চ্যাপেল এত খাপ্পা কেন? ব্র্যাডম্যান কেন আর দরজা খুললেন না? পাকিস্তানকে হারাবার পর ড্রেসিংরুমে কার মুখ নিস্তেজ হয়ে গেল?

'নতুন বলের মুখে' এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েই দম নেয়নি, পাঠককে নিয়ে ফেলেছে বাইশ গজের ঠিক

মধ্যিখানে। .... এক একটি লেখা যেন এক একটা অণু উপন্যাস—তার নাটক, মাধুর্য, শিহরণ, গতি আর হৃদস্পন্দন সমেত।'[২০]

বা,

ভারতীয় দলে সৌরভকে প্রতিমুহূর্তে বিরক্ত আর অপমান করার চেষ্টা চলে কেন? কারা এই কুচক্রী? বডিলাইনের বিরুদ্ধে সৌরভের রক্ষাকবচ কোন তেরোটা পরামর্শ? কপিল দেবকে কীভাবে অপমান করলেন আজহার? সচিনকে কেন 'এন সি' বলে ডাকা হয়? বয়কটদের সংসারে এক ভাষ্যকারের সঙ্গে অন্যের চুলোচুলিটা কেমন? ভারতীয় শিবির থেকে রিভার্স সুইংয়ের রহস্য ফাঁস হয়ে গেল কীভাবে? আক্রমকে কি ইমরান বলেছিলেন, হায়, ওয়াসিম তুমিও?

'বডিলাইনের যুদ্ধে' নিছকই চাঞ্চল্যকর এই সব প্রশ্নের উত্তর নয়। ভিন্ন মননে সমাহিত রুদ্ধশ্বাস ক্রিকেট কাহিনী। রোমান্স, যুদ্ধ, চক্রান্ত, বিশ্বাসভঙ্গ, বুদ্ধি, পরিশ্রম, ত্যাগ, হানাহানি, সাফল্য ও ব্যর্থতা—জীবনের সব রংই এই বইয়ের চৌবাচ্চায় কমবেশি চোবানো।'[২১]

অথবা জানিয়ে দেওয়া হয়, বইতে কী আছে, কী নেই—

নেই—ম্যাচ গড়াপেটা সম্পর্কিত লোমহর্ষক আবিষ্কার। প্রখর গবেষণামূলক ভবিষ্যদ্ধর্মী কাজ।

আছে—এক ক্রিকেট রোমান্টিকের উদ্‌ভ্রান্ত আঁচড়—দু'হাজার সাল থেকে যেভাবে শিহরিত, রক্তাক্ত, মূর্ছিত, অসম্মানিত এবং মত্ত করেছে।'[২২]

ভাষার চাকচিক্য দেখে তাক লেগে যায়, কিন্তু এখানেই শেষ নয়। মলাটের চৌকাঠ ডিঙিয়ে যদি সূচিপত্রে চোখ রাখা যায়, তাহলে হাজির হতে হয় রহস্যের আর এক অলিন্দে। যেখানে প্রায় উনিশ শতকীয় বটতলার ঢঙে লেখক অধ্যায়ের নামকরণ করেন; যেমন—'কপিলের সঙ্গে চিতায়', 'আজহারের বন্ধুদের খোঁজে', 'স্টিভের অশ্বমেধ যজ্ঞ', 'বুড়ো ঘোড়ার যন্ত্রণা', 'কপিলের দ্বিতীয় হানিমুন', 'আদি অপরাধী মনোজ, বংশধর আজহার', 'বালক বীরের বেশে', 'একা তেণ্ডুলকরের শহিদ বেদি কেন', 'এই জয়সিংহ রাজপুত ছিলেন না', 'এরিক রোয়ানের সঙ্গে দুঃসহ এক ঘণ্টা', 'ইমরান মানে ২+২=৬৪', 'কাঁটার মুকুট', 'তোমার মন নেই সচিন', 'সূতপুত্রের যন্ত্রণা', 'চাণক্যের পদবী জার্ডিন', 'ঘটির বডিলাইন সংহার', 'কার্ডাস বংশের সমাধিতে', 'হিম্যানদের অপমৃত্যু' ইত্যাদি। বস্তুত নামকরণের মধ্যেই এমন একরকম বিজাতীয় আকর্ষণ রয়েছে যে, শুধু খেলার পাঠকই নয়, সাধারণ পাঠকের কাছেও তা হাজির হয় ভিন্ন আবেদন নিয়ে। লেখকও বিমুখ করেন না কাউকে, বিবিধ রহস্য-ঘনঘটার যবনিকা উত্তোলন করে চলেন। রহস্য থাক, আপাতত তাঁর তদন্তের একটা নমুনা দেওয়া যেতে পারে—

প্রায় দশ মিনিট হল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনের ঘরের বাইরে আমরা একেবারে ঘাপটি মেরে বসা। আমি ও কলকাতারই লোকেন্দ্রপ্রতাপ শাহি। ঘাপটি—কারণ সামান্য আলোচনাও যদি কাঠের দরজা ভেদ করে ভেতরে যায় তাহলেই মহাবিপদ। সামনের শিকার, যাকে ঘ্যাঁক করে ধরার জন্য আমরা এমন সন্তর্পণে বসা সে অন্য দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে। .... অধীর অপেক্ষায় বসে আরও ভাবছি, লোকটাকে কি স্পোর্টসম্যান দেখতে? নাকি মধ্যবিত্ত, বুড়োটে মার্কা হবে? শুনেছি খুব ছোটবেলায় পোলিও আক্রমণ বড় ক্রিকেটার হতে দেয়নি। হার্ডলার হিসেবে নাম করেছিল।'[২৩]

এখানে জানিয়ে রাখা যেতে পারে লেখক অপেক্ষা করছিলেন জন ব্র্যাডম্যানের জন্য, কিংবদন্তী ক্রিকেটার ডন ব্র্যাডম্যানের ছেলে। ব্র্যাডম্যান আর লোকসমক্ষে আসেন না, তাই ছেলের পিছনেই ধাওয়া করেছেন গৌতমবাবু। যদি ছেলের মুখ থেকে বাবা নিয়ে বিতর্কিত কোন মন্তব্য বের করে নেওয়া যায় তাহলেই সিদ্ধি। এইরকম গসিপধর্মী বিতর্ক তৈরির চেষ্টা তাঁর অন্য লেখাতেও রয়েছে। যেমন—

'বিরানব্বইয়ের ১৯ ফেব্রুয়ারি। সিডনি মাঠের পিছনে প্র্যাকটিস এরিনায় ঢুকেছি ভারতীয়দের হালচাল

> দেখতে। .... আমার প্রথম কাজ, কয়েকটা উদ্ধৃতি জোগাড় করে সেগুলো গুঁজেটুজে, টিমটার উপর স্টোরি পাঠানো। দ্বিতীয় কাজ আজহারের প্রতিক্রিয়া নেওয়া। ক'দিন আগে এ মাঠেই অধিনায়ক জঘন্য শটে ভারতের হার নিশ্চিত করার পর ইয়ান চ্যাপেল চ্যানেল নাইনে মন্তব্য করেছেন, 'আজহারের পশ্চাদ্দেশে লাথি মারা উচিত।' কোথাও এর জবাবে আজহারের প্রতিক্রিয়া বেরোয়নি।''[২৪]

প্রতিক্রিয়া যেমনই মিলে থাকুক তখন, এটুকু বুঝতে সমস্যা নেই, এই লেখার সঙ্গে খেলার যোগ অল্প, নেই বললেই চলে। বস্তুত ক্রীড়াবিদ্‌দের সেলিব্রিটি ঠাউরে, নাছোড় পাপারাৎজি সংস্কৃতির মতো পিছনে লেগে থেকে গল্প তৈরি করার দিকেই এখানে লেখকের ঝোঁক বেশি। যে কারণে, প্রাক্তন ক্রিকেটার জয়সিংহ প্রয়াত হওয়ার পরে তাঁর খেলোয়াড়ি জীবন নয়, ব্যক্তিগত কেচ্ছাকাহিনির খবরই লেখক শুনিয়ে যান অকারণে। নারীগমন থেকে নৈতিক ভ্রষ্টাচার, জয়সিংহ নিয়ে নির্বিবাদে স্মৃতিচারণ করেন তিনি—

> চোখ বুজে জয়সিংহকে মনে করার চেষ্টা করছি এবং কী দেখছি? না হাতে হুইস্কির গ্লাস, ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট, মুখে সবসময় হাসি, সুদর্শন একটা লোক। অবসর জীবনে তাঁকে যৎসামান্য দেখে আমার বিশ্বাস, জীবনের ভরকেন্দ্রে তিনটি শব্দ গুছিয়ে রেখেছিলেন জয়সিংহ, খাও, পিও এবং জিও। আর তাই তাঁর ইনিংসটা এমন হ্যাঁচকা টানে ষাটেই ফুরিয়ে গেল।'[২৫, ২৬]

প্রায় গল্প-কাহিনির চরিত্রের মতোই মতোই জয়সিংহকে হাজির করা হয়েছে এখানে। মূল লেখাটিও ডানা বিস্তার করেছে মশালাদার আখ্যানের মোড়কেই। বিশেষ কোন ক্রিকেটীয় ভাব পরিমণ্ডল নেই, পরিসংখ্যান নেই, ম্যাচের বিবরণ নেই, আলাদা করে বুঝিয়ে না দিলে শনাক্ত করা শক্ত লেখার মূল উপজীব্য জয়সিংহ ভদ্রলোকটি কে, খেলোয়াড় না খেলার বাইরের অভিজাত কোন আত্মাচারী খামখেয়ালী মানুষ।

এরকম একটি বা দুটি লেখা নয়, এমনই অজস্র কপি। আরও উদাহরণ দেওয়া যেত, দরকার নেই। স্বভাবতই মতি নন্দীর মতো বিশুদ্ধবাদীর পক্ষে এ জিনিস হজম করা শক্ত। তাই 'দ্বিতীয় ইনিংসের পর' উপন্যাসে নিজের প্রতিবাদটুকু তিনি লিপিবদ্ধ করে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন সরোজ চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে। বাকিরা যখন গসিপ লেখে, সরোজ তখন নিবিষ্ট মনোযোগে রিপোর্ট পাঠায় পিচের চরিত্র নিয়ে, দল গড়ার সম্ভাবনা নিয়ে। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দলের সবচেয়ে প্রতিভাবান ক্রিকেটারটি, যাকে নিয়ে সারা দেশ উত্তাল, সরোজ তার সাক্ষাৎকার নেয় না। হয়তো এই একটি সাক্ষাৎকার পরের দিন পেপারের কাটতি বাড়াতে পারতো, তা সত্ত্বেও সরোজ নিরুত্তাপ থাকে। বদলে ম্যাচ রিপোর্ট লেখার সময় সরোজ ভাবে এই পরিস্থিতিতে নেভিল কার্ডাস থাকলে কী লিখতেন? কার্ডাসীয় ভাবনা, সেই ভাষাগত অতীত ও সাহিত্যগুণ সরোজ প্রাণপণে লেখার মধ্যে আনার চেষ্টা করে। সম্পাদক সে লেখায় খুশি হন না, তিনি আরও ভেতরের খবর চান, চান আরও রঙিন ছবি। সম্পাদকের মনোমতো খবরও সরোজের নাগালে আসে। ক্রিকেটারদের একান্ত ব্যক্তিগত যাপন, যৌনতা এবং আদিম মৌতাতের রেশ সরোজের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায় চার্চে রাখা খোলা ধর্মগ্রন্থের মতো। অথচ সরোজ আগ্রহ দেখায় না। মুহূর্তের জন্য দুর্বল হলেও সে সংযত করে নিজেকে।

মতি নন্দী নিজেও তো এমনই ছিলেন। মাঠের বাইরে কাউকে নিয়েই তাঁর আগ্রহ নেই, কারুর সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা নেই। রিপোর্টার থাকাকালীন কোনোদিন দৌড়োননি তারকা ক্রীড়াবিদদের পেছনে। পত্রিকা থেকে জোর করলেও নিজের অবস্থানে দৃঢ় থেকেছেন।[২৭] গৌতম ভট্টাচার্য তাঁর একটি লেখায় জানিয়েছেন ময়দানে দিনের পর দিন ক্রীড়া সাংবাদিকতা করার পরেও জনপ্রিয় কোনো ক্রিকেটার বা ফুটবলারের সঙ্গে মতি নন্দীর আলাপ ছিল না। যেমন সুব্রত ভট্টাচার্য নিয়ে অজস্র সুন্দর ম্যাচ রিপোর্টিং করলেও, সুব্রতকে ব্যক্তিগতভাবে তিনি চিনতেন না।[২৮] এই ঘটনা মতি নন্দীর অবস্থানকে পরিষ্কার করে।

মতি নন্দী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যতই টিভি আসুক, 'সাংবাদিকদের নিজস্ব মনন, দৃষ্টিভঙ্গী কিংবা চিন্তার ফসল দিয়ে বোনা ম্যাচ রিপোর্ট সমান তালে পাল্লা দিতে পারে টেলিভিশনের সঙ্গে।'[২৯] তাই স্টোরির পিছনে না দৌড়ে

নিজের অধীত বিদ্যা অনুযায়ী তিনি চলেছেন আজীবন। তাঁর চরিত্র সরোজও তাই করেছে। উপন্যাসের শেষে সরোজের ক্রিকেট প্রজ্ঞাকে কোথাও গিয়ে শঙ্করদের লাস্যের বিরুদ্ধে জিতিয়ে দিয়েছেন তিনি। অন্ধকারের খবর খুঁড়তে খুঁড়তে শঙ্কর এবং শঙ্করের মতো সাংবাদিকরা অন্ধকারেই বলি হয়েছে। পক্ষান্তরে সরোজরা টিকে গেছে। টিকে গেছে তাদের সাবেকিয়ানা এবং পুরাতন মূল্যবোধকে সম্বল করে। এই জয় কতটা বাস্তবসম্মত তা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে, কিন্তু দিনের শেষে এটি মতি নন্দীর জবানি। এই জবানিধৃত পক্ষপাত, আর পক্ষপাতের নিহিত কারণ যে যুগান্তরেও তন্নিষ্ঠ পাঠকের এজলাসে ধারালো সওয়াল-জবাবে মুখর থাকবে, তা বুঝে নিতে আমাদের বিশেষ অসুবিধে হয় না।

তথ্যসূত্র এবং প্রাসঙ্গিক মন্তব্য

১. উৎসর্গপত্র, মতি নন্দী, 'দ্বিতীয় ইনিংসের পর', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৫।
২. মতি নন্দী, 'খেলা সংগ্রহ', মণ্ডল এণ্ড সন্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৩১৪।
৩. মতি নন্দী, 'কিশোর সাহিত্য সমগ্র' (২), পাবলিশিং প্লাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৩৯২।
৪. চিরঞ্জীব, 'ইত্যাদি কথা', সিটাডেল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৫।
৫. অশোক দাশগুপ্ত, 'উটকো সাংবাদিকের ডায়েরি', আজকাল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ. ৪৫।
৬. মতি নন্দী, 'দশটি উপন্যাস', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, পৃ. ৩৭২।
৭. তদেব।
৮. তদেব, পৃ. ৩৮০।
৯. তদেব, পৃ. ৩৭১।
১০. তদেব, পৃ.
১১. তদেব, পৃ.
১২. তদেব, পৃ.
১৩. উৎসর্গপত্র, মতি নন্দী, 'দ্বিতীয় ইনিংসের পর', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬।
১৪. সব্যসাচী সরকার, 'সবার শচীন আমাদের সৌরভ', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ. ১২।
১৫. তদেব, পৃ. ৩৬।
১৬. তদেব, পৃ. ৩০।
১৭. তদেব, পৃ. ৩৭।
১৮. তদেব, পৃ. ৮১।
১৯. সব্যসাচী সরকার, 'লর্ডস থেকে টনটন', আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ২৮, ২৯।
২০. মলাট, গৌতম ভট্টাচার্য, 'নতুন বলের মুখে', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০১।
২১. মলাট, গৌতম ভট্টাচার্য, 'বডিলাইনের যুদ্ধে', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০।
২২. মলাট, গৌতম ভট্টাচার্য, 'বডিলাইনের বিরুদ্ধে', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০১।
২৩. 'বডিলাইনের বিরুদ্ধে', পৃ. ১১।
২৪. 'নতুন বলের মুখে', পৃ. ১২৪।
২৫. 'নতুন বলের মুখে', পৃ. ১৭৬।
২৬. জয়সিংহ ওরফে জয়সিম্‌হাকে নিয়ে লেখা এই ওবিচুয়ারিটি ঘিরে তৎকালীন সময় যথেষ্ট জলঘোলা হয়েছিল। কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রতিবাদ করে চিঠি লিখেছিলেন। চিঠির কিছুটা তুলে দেওয়া গেল এখানে, *'আমার ধারণা গৌতমবাবু জয়সিম্‌হাকে খেলতে দেখেননি এবং তৎকালীন মিডিয়া হাইপের সঙ্গেও পরিচিত নন, কারণ জয়সিম্‌হাকে নিয়ে কাগজে বড় একটা আদিখ্যেতার কথা মনে পড়ছে না। টিভি ও ওয়ান-ডে ক্রিকেটের আগে হাইপ বস্তুটি ছিল না, আমাদের দেশের মিডিয়া যথারীতি ক্রিকেট আলোচনা করে কর্তব্য পালন করত। এখনকার মতো ক্রিকেটের*

বাইরের কেচ্ছা নিয়ে খুব কমই লেখালিখি হত। সে যাই হোক, মৃত্যুর খবর না পেলে কলকাতার লোক জয়সিম্‌হাকে ভুলেই গিয়েছিল। এইভাবে এক জনপ্রিয় পত্রিকার মাধ্যমে এক বাঙালির হাতে এই বিশিষ্ট ভদ্রলোক ক্রিকেটারের মৃত্যুর দশ দিনের মাথায় এবম্প্রকার কুরুচিকর আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করার কী প্রয়োজন ছিল বুঝে উঠতে পারছি না।' (কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'দিশি গান বিলিতি খেলা', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০২, পৃ. ১৬৭)

২৭. 'মতি নন্দী', সম্পা. মানস চক্রবর্তী, দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২০৬।

২৮. তদেব, পৃ. ২০৪।

২৯. মতি নন্দী, 'খেলা সংগ্রহ', মণ্ডল এণ্ড সন্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৩১৬।

রাহুল পণ্ডা,
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বালুরঘাট ওমেন্স কলেজ, দক্ষিণ দিনাজপুর

প্রতিভা বসুর দেশভাগের উপন্যাস : দেশছাড়া বাঙালির মর্মকথা

সুখেন্দু বিশ্বাস

একটি জাতি হিসাবে বাঙালি জীবনের সবচেয়ে বড়ো আঘাত দেশভাগ। দেশভাগের আগে বাঙালিজীবন যে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ ছিল, দেশভাগের প্রবল ধাক্কা দুই বাংলার বাঙালি সংস্কৃতির চিরবন্ধনকে যেন আলগা করে দিল। ফলে এদেশে যেমন মুসলিমদের অনধিকার বসবাস বলে হিন্দুরা মনে করতে লাগল, তেমনি পূর্ববঙ্গের (পূর্ব পাকিস্তানের) মুসলিমরাও ভারত-বিরোধিতা আর হিন্দু-বিরোধিতাকে এক করে দেখতে লাগল। এই আবহে ওপার বাংলার হিন্দুরা চলে এল এপার বাংলায়, আর এপার বাংলার মুসলিমরা চলে যেতে লাগল ওপার বাংলায়। কিন্তু ওপারের হিন্দুরা এপারে এল সর্বস্ব ফেলে উদ্বাস্তু হয়ে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে; আর এপারের মুসলিমরা ওপারে গেল এক নিশ্চিত আশ্রয়ের ভরসা নিয়ে। কিন্তু তারপর? দেশভাগের সত্তর বছরে এই দুই দেশছাড়া জনগোষ্ঠী দুই ভিন্নদেশে ভিন্নতর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হল।

দেশভাগে সমগ্র বাঙালি জাতি যেভাবে রক্তাক্ত হয়েছে, ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, মর্মে মর্মে অনুভব করেছে তার যন্ত্রণা, পরবর্তী সময় তার সেই হৃদস্পন্দন ধরা পড়েছে দেশভাগ-পরবর্তী সাহিত্যে। সাহিত্য যেহেতু মানুষের জীবনের অভিঘাতময় শিল্পরূপ তাই দেশভাগের ছিন্নমূল মানুষের দুর্দশার চিত্র প্রত্যক্ষ করে তাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা বাংলাতে যে সাহিত্য পেয়েছি তার অধিকাংশই সাহিত্যিকের জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির প্রকাশ। কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে কোটি কোটি মানুষের উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণার চিত্র সর্বত্র ছড়িয়ে থাকলেও এ বঙ্গের সাহিত্যিকগণের লেখায় তার প্রতিফলন ততটা প্রকটভাবে দেখা যায়নি। যতটা দেখা গেছে পশ্চিমভারতের সাহিত্যে। তবুও দেশভাগ ও উদ্বাস্তুজীবন নিয়ে যেটুকু সাহিত্য বাংলাতে রচিত হয়েছে তাতে দেখা গেছে, সাহিত্যিকের জীবন কোনো-না-কোনো ভাবে দাঙ্গা, দেশভাগ বা দেশত্যাগের সঙ্গে যুক্ত থেকেছে। প্রথমে জীবনানন্দ দাশের 'জলপাইহাটি' ও 'বাসমতীর উপাখ্যান' উপন্যাস দু'টি কথাই ধরা যাক। এই দু'টি উপন্যাসেরই প্রেক্ষাপট দেশভাগ। জীবনানন্দ দাশ নিজেই যেহেতু দেশত্যাগী বাস্তুহারা একজন মানুষ সেহেতু বাস্তুহারা মানুষের জীবন-যন্ত্রণা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। আর তাঁর সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে এই দুটি উপন্যাসে।

দেশভাগের ফলে বাস্তুহারা জীবনের সংকট ও যন্ত্রণা অনুভবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন অমরেন্দ্র ঘোষ তাঁর 'ভাঙ্গছে শুধু ভাঙ্গছে' (১৯৫০), 'মন্থন' (১৯৫৪), 'ঠিকানা বদল' (১৯৫৭) ইত্যাদি উপন্যাসে। অমরেন্দ্র ঘোষের জন্ম পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলায়। দেশভাগের সময় ভিটেমাটি ছেড়ে সপরিবারে চলে আসতে হয় কলকাতায়। সুতরাং বাস্তুহারা জীবনের যন্ত্রণা তিনি অনুভব করেছেন নিজের জীবনে। তাঁর এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে পরবর্তী সময়ে লেখা উপন্যাসগুলিতে। গৃহহীনের যন্ত্রণা নিয়ে অচ্যুত গোস্বামী লিখেছেন 'কানাগলির কাহিনী' (১৯৫৫) উপন্যাস। এই সকল উপন্যাসের একটাই মর্মকথা গৃহহীনের জীবন যন্ত্রণা। পূর্ববঙ্গে যাদের গৃহ ছিল, সম্বল ছিল, তারা এই বঙ্গে হ'ল গৃহহীন, সহায়সম্বলহীন, তাদের জীবনে দেখা দিল এক চরম অর্থনৈতিক সংকট। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এদের জন্য যে ব্যবস্থা করল, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। পূর্ববঙ্গের ধোপা-নাপিতের মতো শ্রমজীবী মানুষ এদেশে এসেও শুরু করল তাদের পুরনো পেশা। কিন্তু সমস্যায় পড়ল মধ্যবিত্তরা। ফলে সরকারী প্রচেষ্টায় এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হল না। সেই সময়ের একটি প্রতিবেদনে জানা যায়—

বিশ্বাস, সুখেন্দু : প্রতিভা বসুর দেশভাগের উপন্যাস : দেশছাড়া বাঙালির মর্মকথা
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 2, Dec 2021, Page : 41-50, ISSN 2249-4332

Government's failure of manage the gignatic exodus of refugee Population from East Pakistan. The denied the refugee families any kind of shelter for pretty long time." [১]

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরের মানুষ। ফলে বাস্তুভিটা বিদেশ হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা এবং পূর্বপুরুষের আজন্ম-লালিত বাসস্থান ফেলে ছিন্নমূল হয়ে শিকড়ের সন্ধানে ছুটে চলার উৎকণ্ঠা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবন অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর 'উপনগর' ও 'মহানগর' উপন্যাস দুটিতে এবং 'পালঙ্ক'-এর মতো কিছু গল্পে। আর পশ্চিমবাংলায় দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষের জীবনসংগ্রাম নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তার 'অর্জুন' (১৯৭১) উপন্যাসে রয়েছে উদ্বাস্তু কলোনীতে থাকার সংগ্রামের ইতিহাস। এর আগে রমেশচন্দ্র সেনও দেশভাগ পরবর্তী জীবনের চিত্র এঁকেছিলেন তাঁর 'পূর্ব থেকে পশ্চিম' (১৯৫৬) উপন্যাসটিতে। আর প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' তো নিজের বাল্য ও কৈশোরের স্মৃতির উপাদান নিয়ে গড়ে ওঠা উপন্যাস।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি অর্থাৎ দেশভাগের পরে বাংলার এই ভয়ংকর সমস্যার বিষয়টি নিয়ে নানা সাহিত্য রচিত হলেও এই সময় মহিলা-রচয়িতার সংখ্যা খুবই নগণ্য। কিছু পরে জ্যোতির্ময়ী দেবী 'এপার গঙ্গা ও ওপার গঙ্গা' লিখলেন। আর সেই সময় প্রতিভা বসু লিখলেন 'সমুদ্রহৃদয়' ও 'আলো আমার আলো' উপন্যাস দুটি। উপন্যাস দু'টির বিষয় দেশভাগের পরবর্তী উদ্বাস্তু মানুষের জীবন-সংগ্রাম। প্রতিভা বসুর উপন্যাস মূলত নারীপ্রধান উপন্যাস। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তুজীবনের সংগ্রাম এসবের মধ্যে নারীর ভোগ্যপণ্য, অত্যাচারিত, ক্ষত-বিক্ষত রূপই এসেছে সাহিত্যের আঙিনায়। কিন্তু এ সবের মাঝে নারীরও যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে পরিবারে, তারও যে একটা প্রতিবাদ আছে এসকল বিষয় সাহিত্যে স্থান পায়নি। প্রতিভা বসুর এই দুটি উপন্যাসেই নারীর ভূমিকাই প্রধান হয়ে উঠেছে। উপন্যাস দুটির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে নারীকে ঘিরেই। সেই সঙ্গে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত ঘটনাপ্রবাহের মাঝে পবিত্র প্রেমেরই জয়গান ঘোষিত হয়েছে।

'সমুদ্রহৃদয়' (দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৯৯) উপন্যাসটি দেশভাগ ও তার পূর্বমুহূর্তের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা এবং পরবর্তী সময়ে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের অস্তিত্বের সংকট; আর এর মাঝে ফল্গুধারার মতো বয়ে চলা প্রেমের আবহ নিয়ে রচিত। উপন্যাসের দুটি অংশ। প্রথম অংশে রয়েছে পূর্বপাকিস্তানের নবাবগঞ্জের নবাব আমির আলি সাহেব এবং কমলাপুর গ্রামের উকিল ভুবনমোহন তালুকদার—এই দুটি পরিবারের মধুর সম্পর্কের কাহিনি। আমির আলি সাহেব মুসলিম অভিজাত ব্যক্তি হলেও হিন্দুদের প্রতি তার কোনো বিদ্বেষ ছিল না। হিন্দু মন্দিরের অনুষ্ঠানেও তিনি যেতেন। ভুবনমোহন বাবুর বাড়ির নানা অনুষ্ঠানে তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন। হিন্দু-মুসলিম এই দুটি পরিবারের মধুর সম্পর্ক যেন দাঙ্গা-পূর্ববর্তী বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরে। উপন্যাসের এই অংশে দেশভাগ বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কোন আভাস নেই। এভাবেই চলে যায় দুটি প্রজন্ম।

উপন্যাসের পরবর্তী অংশে রয়েছে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি হবার প্রেক্ষাপট। আমরা উপন্যাসে পাই নবাব আমির আলি সাহেবের নাতি সুলতান আহমেদ ও ভুবনমোহন বাবুর নাতনি সুলেখার মধ্যে চরম বিদ্বেষ। সুলতান আহমেদের দাদু ও বাবা যতটা উদার মনের পরিচয় দিয়েছে নাতি সুলতান ততটাই হিন্দু-বিদ্বেষী। এই সুলতানই পরোক্ষে হিন্দু নিধনে প্রেরণা যুগিয়েছে। আর সুলেখা উচ্চশিক্ষিত, নবাবগঞ্জের ভিক্টোরিয়া কলেজের কৃতী ছাত্রী। সেই সঙ্গে নবাবগঞ্জের বিপ্লবীদলের সঙ্গেও যুক্ত। স্বাভাবিকভাবে অনেক হিন্দুর মতো সুলেখার মনেও সুলতানের প্রতি ঘৃণা বাড়তে থাকে। এক একসময় তাকে খুন করার পরিকল্পনা করে। অথচ ছোটোবেলা থেকে এই দুই বাড়িতে স্বাভাবিক যাতায়াতের ফলে সুলতান ও সুলেখার মাঝে একদিন গড়ে উঠেছিল মধুর সম্পর্ক। এই বাল্যকাল থেকেই সুলেখাদের বাড়িতে এক অসম্মান সুলতানের মনে হিন্দুদের প্রতি চরম ঘৃণা তৈরি করে দেয়। সেদিন থেকে সে আর সুলেখাদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দেয়। তারপর আজকের এই বিদ্বেষ।

বিপ্লবী দলে সুলেখা একজন নেত্রী হিসাবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকারের প্ররোচনায়

এবং সুলতান সাহেবের মদতে যে এই দাঙ্গা, একথা সুলেখা অনুভব করে। এজন্য সুলতানকে শাস্তি দেবার জন্য বিপ্লবী দলের নেতা 'সেন দা'-র কাছে অনুমতি চায়। কিন্তু সে অনুমতি পায় না। শেষে একদিন সুযোগ চলে আসে। দাঙ্গা পরিস্থিতি সমাধানের জন্য একটা মিটিং ডাকা হয় নবাবগঞ্জে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন নবাব সুলতান আমেদ। সুলেখা এই সুযোগটাকে হাতছাড়া করতে চায় না। সে সুলতানকে সন্ধ্যাবেলায় কলেজের নির্জন একটি গাছের তলায় দেখা করতে বলে এবং বুকের মধ্যে একটি ছুরি লুকিয়ে অপেক্ষা করে। কিন্তু উপযুক্ত সময় সে যখন সুলতানকে ছুরি বিদ্ধ করতে যায় তখন সুলতান একহাতে সুলেখার হাত ও অন্য হাতে সুলেখার নাকে ক্লোরোফর্ম মেশানো রুমাল চেপে ধরে গাড়িতে তুলে নেয়। সুলতানও এমনই একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। এরপর সুলেখার স্থান হয় নবাবের প্রাসাদের সবুজ মহলে। সেখানে সুলেখা তিন মাস বন্দী থাকে। ফলে সুলতানের প্রতি ঘৃণা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু এই তিন মাস একদিনের জন্যও সুলতান সুলেখাকে স্পর্শ করেনি। শুধু তাই নয় যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে তার যত্ন নেবার জন্য প্রাসাদের শ্রেষ্ঠ দু'জন বাদীকে রেখেছেন।

বাইরে তখন প্রবল হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা চলছে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসতে শুরু করেছে। সুলেখা এ সবের কিছুই জানতে পারে না। সুলতান প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা সুলেখার কাছে আসে। দুটি পরিবারের পূর্ব-স্মৃতি রোমন্থন করে এবং চলে যায়। সুলেখার প্রতি সুলতানের গভীর প্রেম সুলেখার মনের বিদ্বেষকে মুছে ফেলতে ব্যর্থ হয়। তারপর একদিন সুলেখা জানতে পারে তাদের বাড়ি মুসলমানরা আক্রমণ করলে এই সুলতানই সুলেখার মা ও ভাই দুটিকে বোরখা পরিয়ে এরোপ্লেনে কলকাতা যাবার ব্যবস্থা করে দেয়। এই খবর শুনে সুলেখা তার মায়ের কাছে যেতে চায়। নবাব কলকাতায় লোক পাঠিয়ে জানতে পারে সুলেখার মা তাঁর কাকার বাড়িতে আছেন। নবাব সুলেখারও যাবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু যাবার আগে পর্যন্ত নবাব সুলেখাকে জানিয়ে দেয় যে, বালক বয়স থেকে যে মেয়েকে সে মনের মধ্যে লালন করে এসেছে, সে সুলেখা। আর সুলেখা যেটা মনে করে, সেটা সুলতানের আসল পরিচয় নয়। মনের মধ্যে হিন্দুদের প্রতি রাগ থাকলেও সুলতান কখনও এই হত্যালীলাকে প্রশ্রয় দেয়নি। সুলেখা এই কথা বিশ্বাস করে না। সে চলে যেতেই চায় এবং আজই। কিন্তু সুলতান তাকে একা যেতে দিতে রাজি নয়। তার একটি কারণ যেমন প্রাসাদের বাইরে সুলেখা নিরাপদ নয়; অপর কারণটি শেষদিন পর্যন্ত সে সুলেখার পাশে থাকতে চায়। সেই রাতেই দু'জনে এরোপ্লেনে কলকাতা পৌঁছয়। কিন্তু কলকাতায় দেখা যায় ভিন্ন দৃশ্য। সেখানে চলছে মুসলিম নিধন। এখানে সুলতান নিরাপদ নয়। সুলেখা সুলতানের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। সে তাকে ফিরতি প্লেনেই চলে যেতে বলে। যে মানুষটিকে খুন করা ছিল সুলেখার একমাত্র লক্ষ্য, আজ তার প্রাণরক্ষার জন্যই সুলেখা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু নবাব তাকে এত রাতে একা ছেড়ে দিতে রাজি নয়। নবাব সুলেখাকে পৌঁছে দেয় তার মায়ের কাছে। কিন্তু সেখানে ট্যাক্সির ড্রাইভার লোক জড় করে সুলেখার দাদুর বাড়ি আক্রমণ করে সুলতানকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু সুলেখা কিছুতেই সুলতানকে তাদের হাতে তুলে দেবে না। শেষে সুলতানকে তার স্বামী বলে পরিচয় দিয়ে তাদের কাছে প্রাণভিক্ষা চায়। সুলতানের নবাবী রক্তে আঘাত লাগে। অপরদিকে সুলেখার কাছ থেকে স্বামীর স্বীকৃতি তাকে আত্মহারা করে তোলে। বাইরে বেরিয়ে সে সকলের সামনে নিজের পরিচয় দেয় এবং গুণ্ডারা তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। উপন্যাসটি এখানেই শেষ হয়।

উপন্যাসটি প্রেমের উপন্যাস। কিন্তু এই প্রেম শুধু নারীর সঙ্গে পুরুষের নয়, হিন্দু-মুসলিম দুটি সম্প্রদায়ের বন্ধনেরও। উপন্যাসের প্রথম অংশে দাঙ্গার কোনো চিহ্ন নেই। সেখানে বাঙালি হিসাবে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর যে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ তারই চিত্র রয়েছে। এই আবহের মধ্যেই সুলেখা ও সুলতানের বন্ধুত্বের সূচনা ও প্রেমের অঙ্কুরোদ্গম। প্রতিভা বসু নিজে পিতার বদলির চাকরির সূত্রে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরেছেন। ফলে তার দেখা বাংলার যে চিত্র সেটাই ধরা পড়েছে উপন্যাসের প্রথম অংশে। সেখানে দাঙ্গা নেই, বিদ্বেষ নেই, আছে শুধু প্রীতির সম্পর্ক।

পরবর্তী অংশে স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী আন্দোলনে সুলেখার অনুপ্রবেশ ও ব্রিটিশ মদতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। এক নিমেষে এতদিন লালিত প্রীতির সম্পর্ক যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বিরাট এক অবিশ্বাসের ভীতের উপর দাঁড়িয়ে রইল বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় সরকারের প্রত্যক্ষ মদতের একটা চিত্র তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক।

> 'ভোর না-হতেই পুলিশভ্যান এসে দাঁড়ালো গলির মুখে। পাঠান সৈন্যে ভরে গেলো গলিটা। সার্জেন্টরা নিজে পাড়ার প্রত্যেকটা বাড়ি খানাতল্লাস করলো। একে লাথি মারলো, তাকে গুঁতো দিলো, বিছানা বালিশ ছিঁড়ে-ফেঁড়ে তছনছ করে ফেললো। আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে লাঠি, দা যে-বাড়িতে যে যা সংগ্রহ করে রেখেছিলো, সব নিয়ে চলে গেলো। এমনকি কয়লা-ভাঙা হাতুড়িটা পর্যন্ত বাকি রাখলো না। মশারি টাঙাবার খাটের বাজুগুলোও ছাড়লো না। রাত জেগে যে সব ভলান্টিয়াররা যার-যার নিজের এলাকা পাহারা দিচ্ছিলো, তাদেরও ধরে নিয়ে গেলো বন্দুকের কুঁদোর খোঁচা মারতে মারতে। তারপর যখন বেলা পড়লো, সব বাড়িতে সবাই খেয়ে-দেয়ে ঈষৎ অনবধানে আলস্যে গা এলালো বিছানায়, ঠিক তক্ষুনি হুসনি দালানের অভ্যন্তর থেকে শত শত কণ্ঠের চিৎকার উঠলো, 'আল্লা হো আকবর।' ... যে-শহরে রাস্তায় একসঙ্গে তিনজন লোক দাঁড়ালেও পুলিশ রেহাই দিচ্ছিলো না, গৃহস্থদের দৈনন্দিন জীবনের যন্ত্রপাতিও সেখানে বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছিলো, সেই শহরের বড়ো-বড়ো রাস্তাগুলো সহসা শত-শত মাথায় কালো হয়ে উঠলো। লাঠিসোঁটা, সোডার বোতল কিরিচ, বল্লম, মাংস কাটা ছুরি, ছোরা, কোনো কিছুরই অভাব দেখা গেল না তাদের হাতে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য, যে পুলিশের ভ্যান সারাদিন ভেঁপু বাজিয়ে, বুক কাঁপিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে এখানে-ওখানে আনাচে কানাচে ঘরে বেড়ায় শহর শান্ত রাখার জন্য, তাদেরও দেখা মিললো না কোথাও।'[২]

কিন্তু পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের রাতারাতি হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে ওঠার মূলে একমাত্র দেশভাগই দায়ী নয়। হিন্দু জমিদার ও বিত্তশালীরা চিরকালই মুসলমানদের হীন নজরে দেখেছে। তাদের 'ম্লেচ্ছ' বলে অপমান করে এসেছে। এই ক্ষোভ মুসলমান হৃদয়ে বয়ে চলেছিল চিরকাল। যেহেতু পূর্ববঙ্গের অভিজাত শ্রেণির অধিকাংশই ছিল হিন্দু, তাদের জীবিকার প্রধান উৎসই ছিল হিন্দুরা, তাই এর প্রতিবাদ করার সাহস তারা দেখায়নি। কিন্তু ক্ষোভ যে ছিল সেটা ঔপন্যাসিক এখানে দেখিয়েছে। এমনকি নবাবগঞ্জের নবাব আমির আলি সাহেবের নাতি সুলতানও এই অপমানের হাত থেকে রেহাই পায়নি।

সামনেই ওদের বৈঠকখানা ঘর ছিলো, তার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালেই ছেলেটি টের পেতো, সারা বাড়িতে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছে নবাব সাহেবের জন্য, তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজনে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সেই ব্যস্ত হাঁক-ডাকের মধ্যে প্রায়ই কয়েকটা কথা ছেলেটির কানে এসে তীরের মতো বি'ধতো। 'আরে না না, ওটা না, মুসলমানের হুঁকো আলাদা তা-ও জানিস না? কিংবা রুপোর থালায় পান দে, খাবার দিস না, এঁটো হয়ে যাবে। কাঁচের বাসনে দে, ফেলে দিলেই চলবে।'

বাল্যকালের এই স্মৃতিই সুলতানকে হিন্দু-বিদ্বেষী করে তুলেছে। এই চিত্র বাস্তব। সুলেখা যখন সুলতানকে হিন্দু-বিদ্বেষী, হিন্দু-ঘাতক বলে ঘৃণা ছুঁড়ে দিয়েছে তখন সুলতান তাকে শ্লেষ-মাখা সুরে তার উত্তর দিয়েছে। সেখানে বাইরে হিন্দু-মুসলিম একপ্রাণ এক জাতি বলে যে বড়াই করা হয়, তার অভ্যন্তরে যে গভীর খাদ রয়েছে এবং সে খাদ যে কেবল হিন্দুদেরই সৃষ্টি সেটাই সুলতান সুলেখার সামনে প্রকাশ করেছে তীব্র অসহায় শ্লেষের সুরে।

> 'তবু তোমাকে কতো আতিথেয়তা করছি, দেখছো তো? তোমাদের জাতের চাইতে অন্তত উদার, কী বলো? টানা-টানা চোখ আরো টান করলেন, আর তোমরা হিন্দুরা? ঘরে গেলে জল ফেলে দাও, ছায়া মাড়ালে স্নান করো। ওদিকে বুলি কপচাও হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই। হিপোক্রিট।'[৩]

শুধু সুলতান নয়, সুলেখার বিপ্লববাদের আদর্শ সেনদাও একদিন সুলেখার সামনে এই প্রশ্নটিই তুলে ধরেছিলেন।

> 'মুসলমানরা যে আজ নিজেদের স্বতন্ত্র বলে ঘোষণা করছে, ভেবে দেখতে গেলে তারজন্যে আমরাও কি খানিকটা দায়ী নই? ওদের মনে এই অভিযোগ, এই গ্লানি কেন জমেছে? আমাদেরই অন্যায়ে—''[৪]

দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপটে লেখা বেশির ভাগ উপন্যাসেই দেখা যায়, দেশভাগের ফলে সংখ্যালঘু হিন্দু-সম্প্রদায় মুসলমানদের অত্যাচারে দেশ জুড়ে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছে। সেই সঙ্গে রয়েছে এ বঙ্গে এসে তাদের জীবনসংগ্রামের বিবরণ। কিন্তু এই চিত্রের উল্টোদিকে যে আর একটা বাস্তব রয়েছে, যে বাস্তব মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের দীর্ঘকালের অবহেলা, তাকে তুলে এনেছেন প্রতিভা বসু তাঁর এই 'সমুদ্র হৃদয়' উপন্যাসে। কেবল পর্যবেক্ষণের প্রবল দৃষ্টি থাকলেই এমন বাস্তবকে উপলব্ধি করা সম্ভব তা এর আগে আমরা দেখতে পাইনি। প্রতিভা বসু হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি ছিলেন সহমর্মী। সেজন্যেই সুলতানের মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছেন মুসলমানের হৃদয় যন্ত্রণা। না হলে সুলতানের মনুষ্যত্ব কিন্তু অন্য কথা বলেছে—

> 'তোমরা নিজে থেকেই যতটা মন্দ, যতোটা কুৎসিত, আর যত নিষ্ঠুর, আমি চেষ্টা করেও তা হতে পারিনি। মানুষকে আমি মানুষ হিসাবেই ভালো বেসেছি, জাত হিসাবে নয়।''[৫]

আর এই সত্যের প্রমাণ হিসাবে সে একদিন নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে একটা হিন্দু পরিবারকে রক্ষার জন্য। হয়তো তার মধ্যে সুলেখাকে ভালোবাসার আবেগ ছিল। কিন্তু সুলতানের মতো একজন ধনী শিক্ষিত যুবকের পক্ষে এই প্রেমের আবেগটাই একমাত্র কারণ হতে পারে না। পিতৃ-পুরুষের উদার মনটাও রয়েছে তার মধ্যে। প্রতিভা বসু একজন সূক্ষ্ম শিল্পীর মতো মানবমনের এই সত্যকে পাঠক দরবারে পরিবেশন করে দেশভাগের প্রচলিত দৃষ্টিকোণের বিপরীতে আর একটি অন্যায়কে তুলে এনেছেন।

এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট দেশভাগ হলেও, এর মূলে রয়েছে প্রেম। এই প্রেমের দুটি রূপ। এক, মানবপ্রেম, দুই, ব্যক্তিগত প্রেম। এই ব্যক্তিগত প্রেমই মানুষকে পবিত্র করে পৌঁছে দেয় মানবপ্রেমের দরবারে।

দেশভাগের প্রেক্ষাপটে লেখা প্রতিভা বসুর আর একটি উপন্যাস 'আলো আমার আলো' (দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯)। তবে দেশভাগ-পরবর্তী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, লুণ্ঠন, পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর পাশবিক অত্যাচার ইত্যাদি বিষয় এই উপন্যাসের ভূমিকামাত্র। আসল ভিত্তিভূমি হল পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তু হয়ে আসা পূর্ববাংলার হিন্দুদের জীবন সংগ্রাম। সুতরাং 'সমুদ্রহৃদয়' উপন্যাস যদি হয় দেশভাগজনিত বীভৎসতার প্রথম ভাগ, তাহলে 'আলো আমার আলো' উপন্যাসকে বলতে হবে এর দ্বিতীয় ভাগ। এই উপন্যাসটির মূল উপজীব্যই হল উদ্বাস্তুজীবন। পূর্ববঙ্গের আজন্মলালিত আশ্রয়, পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে শুধুমাত্র জীবন ও নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে লক্ষ লক্ষ মানুষ চলে আসে পশ্চিমবাংলায়। এখানে এসে তাদের নতুন পরিচয় হয় উদ্বাস্তু। পূর্ববাংলার ধনী যে সমস্ত হিন্দু-পরিবার, তারাও সবকিছু ফেলে আসায় পশ্চিমবাংলায় দরিদ্রশ্রেণিতে পরিণত হয়। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে তারা আশ্রয় নেয়। কলকাতার অনেক স্থানে উদ্বাস্তুদের জন্য বসতি তৈরি হয়। এই বসতিগুলি পরিচিত হয় 'রিফিউজি কলোনি' হিসেবে।

এই রকমই রিফিউজি কলোনি বসবাসকারী এক পরিবারকে নিয়ে গড়ে উঠেছে প্রতিভা বসুর 'আলো আমার আলো' উপন্যাস। এই পরিবারের কর্তা গগনেন্দ্র হালদার ঢাকার ধনী পরিবারের সন্তান। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসিতার মধ্যেই স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের নিয়ে জীবন কাটাচ্ছিলেন তিনি।

দেশভাগের পরবর্তী সময়ে সারাদেশে শুরু হল দাঙ্গা। কিন্তু একে দাঙ্গা বলা চলে না। কারণ তা ছিল হিন্দুদের উপর একতরফা অত্যাচার। সরকারের মদতে এই হত্যালীলা হওয়াতে হিন্দুরা কোনো প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেনি। কিন্তু এমন পরিবেশ তো বাংলায় ছিল না। 'সমুদ্রহৃদয়' উপন্যাসে দেশভাগের পূর্বের যে চিত্র আমরা পেয়েছি, সেখানে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটা সম্প্রীতির আবহই ছিল। মাঝে মাঝে দাঙ্গা হয়েছে, কিন্তু তা

কখনোই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়নি। দাঙ্গা যেমন হয়েছে, আবার তা থেমে গিয়ে আগের মতো স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছে সকলে। তবে 'আলো আমার আলো' উপন্যাসে লেখিকা হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির মনোভাবের একটা চিত্র যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মাধ্যমে এক অখণ্ড জাতীয় জীবনের স্বপ্নকেও সামনে এনেছেন। ইংরেজদের চক্রান্তেই যে আমাদের মধ্যে ধর্মের বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে এবং তাতে যে আমরাই দুর্বল হয়ে পড়ছি, সে চেতনারও প্রকাশ ঘটেছে এই উপন্যাসে।—

> 'হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা কিছু নতুন নয় ঢাকা শহরে। ইংরেজ প্রভুদের এই অবদান মাঝে-মাঝেই সেখানে দুর্জয় হয়ে উঠতো পাকা ফোঁড়ার মতো। কয়েকদিন খুব হানাহানি চলতো, দু-পক্ষই হিংসায় মরিয়া হয়ে নেমে যেতো যুদ্ধের আসরে। দুই ধর্মের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তখন বিব্রত হয়ে দরজায়-দরজায় ঘুরে বেড়িয়ে ঠাণ্ডা করতেন নির্বোধদের। বোঝাতেন, 'যা করছো তা তোমাদের সর্বনাশ। যে সর্বনাশ বিদেশী বণিকদের আরো একশো বছর কায়েমী করবে এখানে।'' [৯]

তখন হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শুনত সেসব বক্তৃতা, হৃদয়ঙ্গম করতো সকলে এবং তারপর অনুতপ্ত হতো। তারপর আবার তারা হিংসা ভুলে সহজ হয়ে উঠতো; আবার তারা মেলামেশা, মায়া-মমতা, হাসি-ঠাট্টায় মেতে উঠতো। কিন্তু দেশভাগের পরের বছর যেটা হলো তার কোনো তুলনা রইলো না। সারাদেশ জুড়ে যে নারকীয় হত্যালীলা; দেশ নেই, আইন নেই, শাসন নেই, বেলাগাম এক ধ্বংসলীলা।

এই ধ্বংস যজ্ঞে গগনবাবুর আসবাবের কারখানাটিও পুড়ে ছাই হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, বড়ো জ্যাঠামশায়ের ছেলেও কারখানা থেকে আর বাড়ি ফিরলো না। আরো তিনজন ভাইয়ের কাটা মুণ্ডু গড়াতে লাগলো ঘরের চৌকাঠে। ছোটো বউদি গেলেন ধর্ষণে, বড়ো বউদি গায়ে আগুন দিলেন সম্মান বাঁচাতে। আর যে কে কোথায় ছিটকে গেলো তার কোনো খোঁজ রইল না। এই পরিস্থিতিতে গগনবাবু এক মুসলমান বন্ধুর সহায়তায় রাতের অন্ধকারে পরিবার নিয়ে কুর্মিটোলায় চলে এলেন। ওখানে একটা কোম্পানি সর্বস্ব হারানোদের কলকাতায় নিয়ে আসছিল। গগনবাবুর শেষ সম্বল স্ত্রীর গয়নাগুলো দিয়ে প্লেনে ওঠার ছাড়পত্র পেলেন। আজন্মের বন্ধন ছিন্ন করে বাস্তুত্যাগী গগনবাবু চললেন নতুন বাস্তুর সন্ধানে। কিন্তু প্লেনের মধ্যে ভয়ার্ত, বিমূঢ় মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে গগনবাবু আতঙ্কে কেঁপে উঠলেন। সাতদিন যাবৎ একমাত্র প্রাণের ভয় ছাড়া আর কোনো অনুভূতিই কাজ করেনি। শুধু একটাই চিন্তা কেমন করে পালাবেন এদেশ থেকে। এবার ঘিরে ধরলো অন্য এক ভাবনা। লেখিকার কলমে ফুটে উঠেছে সে সময়ের সকল সর্বহারা উদ্বাস্তুদের একমাত্র দুশ্চিন্তার ছবি—

> 'এরা কে? কোথায় যাচ্ছে? এদের কী পরিচয়? এরা সব কোথায় উঠবে? কোথায় থাকবে? কী করবে? কী খাবে? আমি কোথায় যাবো? আমাকে কে আশ্রয় দেবে? তবে? তবে কী? হঠাৎ গগনবাবু আবার একটা নতুন ভয়ে শিউরে উঠলেন।'' [১০]

এ শুধু গগনবাবুর ভাবনা নয়, একটা ভাবনার স্রোত; যে স্রোত আছড়ে পড়ল এপার বাংলায়। কলকাতা এক স্বপ্নপুরী। সেদিনের দাঙ্গাবিধ্বস্ত মানুষগুলোর কাছে এপার বাংলা যেন স্বর্গ। কোনোভাবে প্রাণ নিয়ে সেখানে পৌঁছেতে পারলেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এসে এই সর্বহারা মানুষগুলো যে অভ্যর্থনা পেল, তার উপলব্ধি আজকের নিশ্চিন্ত জীবনযাপন থেকে অনুভব করা সম্ভব নয়। কলকাতাবাসী সেদিন এই সর্বস্ব হারানো উদ্বাস্তু মানুষগুলোর প্রতি ন্যূনতম মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিটুকুও দেখাতে পারেনি। গগনবাবুরা যখন কলকাতায় পৌঁছোলেন, প্রথমেই তাদের পড়তে হলো নারী পাচারকারীদের খপ্পরে।

কিন্তু শুধু অপরিচিত কলকাতাবাসীর কাছেই নয়, গগনবাবুর ননিপিসির ছেলে দেবেন, যে একসময় গগনবাবুর বন্ধু, ভাই সবই ছিলো, যারা একসময় গগনবাবুর বাড়ির আশ্রয়েই বড়ো হয়েছে। তারাও যেন আজ এক উটকো ঝামেলা মনে করলো। এ এক অচেনা কলকাতা যেখানে আপনজনও পর হয়ে যায়। গগনবাবুর আত্মসম্মানে লাগে।

যিনি দুঃখ কাকে বলে জানতেন না, প্রচুর সম্পদের মধ্যে যার দিন কেটেছে, তাকেই আজ ভাগ্যচক্রে পথে পথে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে। শেষপর্যন্ত একদা বিপ্লবী মানব মিত্রের সহায়তায় একটা আশ্রয় গগনবাবু পেলেন। এই মানব মিত্রের দয়াতেই একখণ্ড জমি পেলেন গগনবাবু। কলকাতার দক্ষিণতম প্রান্তে জঙ্গল হয়ে পড়ে থাকা পাঁচ কাঠা জমি ষোল টাকার বিনিময়ে পেলেন তিনি। এই ভাবেই গগনবাবুর ঠাঁই হল রিফিউজি পাড়ায়।

পূর্ববঙ্গ থেকে ভেসে আসা সকল মানুষের এই একই ইতিহাস। আর এদের সকলেরই শেষ আশ্রয় রিফিউজি পাড়াতে। সেখানে পূর্ববঙ্গের ধনী, গরিব, উঁচু-নিচু, সকলের একই পরিচয়, তারা রিফিউজি। আর লেখিকা এই উপন্যাসে যে রিফিউজি পাড়ার পরিচয় দিয়েছেন সেটি এইরকম—

> ‘রিফিউজি পাড়া। এখানে-ওখানে গজিয়ে ওঠা সব জবরদখলের বাড়ি। মাঝে-মাঝেই একটা করে মস্ত ডোবা। পানাপুকুরে ভরা। মেয়েরা সেখানেই খেজুর খুঁটি বা বাঁশের ঘাটলায় বসে বাসন মাজে, হাত দিয়ে কচুরিপানা সরিয়ে-সরিয়ে জল বার করে ডুব দিয়ে নেয়ে ওঠে। খাবার জল আনে রাস্তার বাঁকে টিউবওয়েল থেকে। প্রত্যেকের দখলে পাঁচ কাঠা করে জমি কিন্তু প্রত্যেকেই বেড়া দেবার সময় পায়ে-চলা রাস্তা থেকে একটু না একটু বাড়িয়েই নেবে, এক-পা হলেও সই। পারলে পাশে অন্যের জমি থেকেও নেবার চেষ্টা করে, তার ফলে ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে, মারামারিও হয়ে যায় কখনো-কখনো। এ-পাড়ায় উঁচুনিচু নেই, শিক্ষা-অশিক্ষার ভেদাভেদ নেই, জাত মেনেও চলে না কেউ। শুধু যারা ব্রাহ্মণ তারা বলে, ঈশ্ তাই বলে শূদ্রের হাতে জল খাবো। মরেছি বলে কি এতোই মরেছি? শুধু ঐটুকুই। নইলে ধোপা নাপিত মুচি কৈবর্ত সবাইয়ের এক নাম। সে নাম রিফিউজি। চোর-জোচ্চোর অসাধু শোনা যায় সকলেই নাকি পূর্ব বাংলার বড়ো বড়ো সব উকিল, মুহুরি, উজির নাজির, ডাক্তার, মাস্টার, জমিদার—অর্থাৎ প্রত্যেকেই এককালে ধনপতি ছিলো, শুধু বিভাগের পরে দেশ পাকিস্তান হয়ে যাওয়ায় এই দশা। কিন্তু যখনি কোনো হামলাবাজির গন্ধ পাওয়া যায়, তক্কে-তক্কে ছুটে যায় এরা, হা রে রে রে করে গিয়ে লাফিয়ে পড়ে, মুখে গালাগালির তুবড়ি ছোটে। এমন সব বাক্য অকাতরে উচ্চারণ করে যা শুনে ভদ্রস্থ ব্যক্তিরা কানে আঙুল দিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু ভদ্র অভদ্রের যেখানে তফাত নেই সেখানে এসব জল-ভাত বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী।’’[৮]

‘আলো আমার আলো’ উপন্যাসে দেশভাগ-পরবর্তী উদ্বাস্তু জীবনের দুটি অধ্যায় পৃথকভাবে চিত্রিত। বাংলাকে দুটি ভাগ করার সঙ্গে সঙ্গে যেন মানুষের জীবনকেও দুটি ভাগে ভাগ করে দিলো। একটি জীবন পড়ে রইলো পূর্ববঙ্গে, আর একটি জীবন শুরু হল পশ্চিমবঙ্গে। পূর্ববঙ্গের জীবনের একপাশে রইল সুখী জীবনের ছবি, আর একদিকে দাঙ্গার বীভৎসতা আর এপার বাংলার রিফিউজি কলোনিতে এসে যে জীবন, তা কেবল নিজের অস্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে কোনো রকমে বেঁচে থাকা। এই পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার জন্য যে কোনো কাজকেই তারা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

আসলে গগনবাবু যে পরিবেশে বড়ো হয়ে উঠেছেন, সেখানে লড়াই কখনো ছিল না। ফলে সচ্ছল জীবনের বাইরের জগৎ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। কী করলে, কী হতে পারে সে ধারণাও তাঁর ছিল না। না হলে যেটুকু সম্বল তাঁর ছিল, তা থেকেই তিনি একটা উপায় বার করতে পারতেন। কিন্তু হঠাৎ চলে আসা এই বিপন্নতা, এই সহায় সম্বলহীন শূন্যতা তাকে দিশেহারা করে দিয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন এই দুর্যোগ একদিন কেটে যাবে, আবার তিনি মাথা তুলে দাঁড়াবেন। কিন্তু দিন যত গেছে তিনি উপলব্ধি করেছেন, তাঁর ভাবনা কেবল দুরাশামাত্র। এই প্রসঙ্গে লেখিকা এক অমোঘ সত্যকে প্রকাশ করেছেন গগনবাবুর ভাবনার মধ্যে দিয়ে—

> ‘হিন্দুদের কোনো স্থান নেই সেখানে, ঘোষিতভাবেই পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র। ঘোষিতভাবেই আধিপত্য

> একমাত্র তাদের, অন্য ধর্ম সেখানে অবাঞ্ছিত। আর সর্বধর্ম-সমন্বয়ের ভারতবর্ষ? আহা, কোল যে মায়ের ভর্তি! অতএব সেখানেও ঠাঁই নেই। কী চমৎকার অবস্থা।"[১]

এই অসহায়তা, এই অসহায়ের আত্মসমর্পণ; লেখিকার ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতাতেও আছে। পূর্ববঙ্গের আবাল্য-লালিত জীবন ছেড়ে একদিন লেখিকাকেও চলে আসতে হয়েছিলো কলকাতায়। উদ্বাস্তু জীবনের চরম লাঞ্ছনা, অপমান হয়তো তাঁর ছিল না। কিন্তু দেশত্যাগের পর জীবন সংগ্রামটা তাঁর জীবনেও ছিল চরম। ফলে তাঁর এই আত্মোপলব্ধি তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যেও প্রভাব ফেলেছে।

উপন্যাসটা এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত বা শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল বলে মনে হয়। কারণ গল্পটা দেশভাগ-পরবর্তী বাস্তুহারা মানুষের পাশবিক জীবনচরিত। এখানে শুধু ত্যাগ আছে, সব হারানোর বেদনা আছে— এই বেদনা শুধু গগনবাবুর একার নয়, সমগ্র উদ্বাস্তুজীবনেরই ইতিহাস। সে ইতিহাস বলা শেষ হয়ে গেছে। একজন স্নেহশীল পিতা তার আদরের মেয়েকে বিক্রি করে দেবার মতো অবস্থার বিপর্যয়ও দেখানো হয়ে গেছে। পরিস্থিতির কাছে হার মেনে এই চরম অসহায় আত্মসমর্পণ দিয়েই উপন্যাসটাকে শেষ করে দেওয়া যেত। কিন্তু প্রতিভা বসু সে পথে হাঁটেননি। তিনি মনে করেছেন, জীবন এখানেই শেষ হয়ে গেলে উদ্বাস্তুজীবনের অর্ধসত্যটা উন্মোচিত হবে। অনেক অপমান, দুঃখ, দুর্দশা, স্বজন হারানোর পরও যারা বেঁচে রইলেন, তাদের জীবনের গতিপথটাকে দেখানোটাও দরকার। কারণ লেখিকা মনে করেন, জীবনের গতি কখনোই সোজা হতে পারে না। সে গতিপথ বদলাবেই। বদলটাও এই জীবনেরই অঙ্গ। তাকে বাদ দিয়ে জীবন পূর্ণ হতে পারে না। লেখিকা এবিষয়ে নিজেই কৈফিয়ৎ দিয়েছেন।

> 'গল্পটা এখানেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল ... কিন্তু এটা গল্প নয়, জীবন। আমার সুবিধা মতো আমি একে কেটেছেঁটে বাদ দিয়ে একটা নির্দিষ্ট পরিণতিতে এনে সমাপ্তি ঘটাতে পারি না। আর পারি না বলেই তারও পরে আরো কোন-একটি অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হলো আমার চোখের সামনে।"[১০]

শুরু হল গল্পের দ্বিতীয় অংশ। আমরা দেখি কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক বিশিষ্ট ধনী, যুগপৎ খ্যাতনামা দেশসেবক ও দুর্দান্ত সাহেব নীলেন্দু নারায়ণ মিত্র তথা মিষ্টার মিত্রকে, যিনি গগনেন্দ্র হালদারের বড়ো মেয়ে অতসীকে কিছুদিনের জন্য কিনে নিয়েছেন লোক মারফৎ। তার জন্যই অধীর আগ্রহে তিনি তাকিয়েছিলেন। কিন্তু অতসী অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায় তার সেবায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। মি. মিত্রের মতো একজন নারীলোলুপ মানুষও এই সেবা করার মাধ্যমেই স্নেহ-ভালোবাসার মর্ম অনুভব করল।

অভিজাত পরিবারের সন্তান হিসাবে নীলেন্দু মিত্রের রুচি, শি[illegible]া, সভ্যতা যেন তার ভোগমত্ত লালসার আবরণে এতদিন চাপা পড়ে গেছিল। আজ যেন দমকা বাতাসে মনের মধ্যের ধুলো উড়ে গিয়ে মার্জিত মানুষটি বেরিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। তিনি জীবনে কখনো ভালোবাসা পাননি, তাই অতসীর একটু ভালোবাসার জন্য তিনি ব্যাকুল। উপন্যাসের এই পর্যায়ে প্রতিভা বসু অমানুষের মধ্যেও মানবিকতার বীজ বপন করলেন।

প্রতিভা বসু নিজের জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য, টিকে থাকার জন্য কঠোর সংগ্রামী এক নাম। তাঁর 'জীবনের জলছবি' থেকে জেনেছি, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সংসার জীবনে তাঁর কঠিন লড়াইয়ের কথা। কিন্তু একটা বিষয় সেখান থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনি কখনো একেবারে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেননি। তিনি আশাবাদী, স্বপ্নভঙ্গের পরও তিনি নতুন করে স্বপ্ন দেখতে জানেন। ফলে তাঁর উপন্যাস কখনোই শুধু হতাশা দিয়ে শেষ হয়ে যায় না। আর জীবনে প্রেমের মূল্য যে কতখানি, তা তিনি দেখিয়েছেন তাঁর উপন্যাসগুলিতে। তিনি মনে করেন, প্রেমই পারে ব্যর্থ জীবনের মাঝে আশাকে জাগিয়ে রাখতে। শুধু তাই-ই নয়, প্রেমের পূর্ণতা যে কত বিচিত্রভাবে হতে পারে এবং তার প্রকাশও যে কত বিচিত্রভাবে ঘটতে পারে, প্রতিভা বসুর উপন্যাসের বিষয়বিন্যাস ও ভাষা না দেখলে তা বোঝার উপায় থাকতো না। এই উপন্যাসে একজন দাম্ভিক, ধনী, একাধিক নারীতে আসক্ত পুরুষ, যে নারীকে শুধু খাঁচায়

বন্দী পাখির মতো অসহায় প্রতিরোধের মধ্যেই ভোগ করতে বেশি আনন্দ পায়; সে-ই একদিন প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করল এবং নিজের দৈন্যতা প্রকাশ করে ফেলল। প্রেমের এমন বিবর্তন ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। হয়ত প্রতিভা বসুর এই বর্ণনার ভাষা একটু নাটকীয় মনে হতে পারে। কিন্তু মানবমনের অনেক পরিবর্তনই হয় এমন নাটকীয়, যার কোনো পূর্ব-প্রস্তুতি থাকে না।

প্রতিভা বসু এই উপন্যাসে দেশভাগ-পরবর্তী উদ্বাস্তু মানুষের জীবন-সংগ্রামের আলেখ্য রচনা করতে চেয়েছেন। লেখিকার হাতে যে আলেখ্য হয়ে উঠেছে মর্মস্পর্শী। কিন্তু এই উপন্যাসকে তিনি আরও একটু এগিয়ে নিয়ে গেছেন। শুধু দেশভাগের যন্ত্রণাতেই উপন্যাসকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি আর একটি পৃথক অধ্যায়কে এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন, যেখানে তাঁর স্বভাবগত লিরিকপ্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে প্রকাশ পেয়েছে সর্বজয়ী প্রেমের মাহাত্ম্য। ফলে এ উপন্যাস দু'টি পৃথক ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এর একদিকে রয়েছে দেশভাগ ও তার পরবর্তী ভয়াবহতা। সেখানে কেবল হৃদয়হীন অসহযোগিতা, অমানবিকতা, পাশবিক জীবন। পুরো সমাজটাই সেখানে একটা গভীর জঙ্গলে পরিণত। সেখানে মানুষ কাটাচ্ছে রিফিউজি কলোনিতে পশুর মতো। আর ধনী, ক্ষমতাশীল মানুষগুলো সবল পশু হয়ে তাদের শিকার করে নিজেদের ভোগের থালার খাবার বানাচ্ছে। ফলে এ এক বাস্তুতন্ত্র। দেশভাগের সব উপন্যাসে কেবল এর একটি দিকের উন্মোচন ঘটেছে। সেখানে কেবল শরণার্থী, দুর্ভিক্ষ, হাহাকার। কিন্তু দেশভাগের আর একটি দিককে লেখিকা স্পষ্ট করেছেন এই উপন্যাসে। আর এই অধ্যায়ে ঘোষিত হয়েছে এই অমানবিক আবহে প্রেমের জয়গান। যে প্রেম মানুষকে এই সীমাহীন দুঃখ-সাগরেও বাঁচার প্রেরণা জোগাবে।

প্রতিভা বসুর দেশভাগের উপন্যাসের মর্মকথা আশাবাদ। জীবনের চলার পথে শোষণ থাকবে বঞ্চনা থাকবে জীবনের নেতিবাচক নানাদিক থাকবে; কিন্তু এ সকলকে অতিক্রম করে মানুষ আবার নতুন পথের সন্ধান পাবে, বেঁচে উঠবে নতুন আশা নিয়ে। জীবনের এই সত্যকে প্রতিভা বসু তাঁর উপন্যাসে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। দেশভাগ মানুষের জীবনের একটা অভিশাপ; সে হাজির হয় এক ভয়াবহতা নিয়ে। কিন্তু এতেই জীবনের সমাপ্তি নয়, বেঁচে থাকার প্রেরণা হাজির হয় এই ভয়াবহতা থেকেই। বাংলা সাহিত্যের আর পাঁচজন ঔপন্যাসিকের থেকে প্রতিভা বসু এখানেই পৃথক ভাবনার এক লেখিকা। প্রতিভা বসুর উপন্যাস তাই ধ্বংস-স্তূপেই শেষ হয়ে যায় না, ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে থেকে ফুটে ওঠা কোনো রক্তকরবী শোভা নিয়ে, সতেজতা নিয়ে হাজির হয় কোনো নতুন জীবনের বার্তা নিয়ে জীবন আবার তার স্বাভাবিক গতি নিয়ে চলতে থাকে নতুন ভোরের দিকে।

তথ্যসূত্র

১. Pranati Choudhury, A Study of the Growth and Distribution of Refugee Settlement within the C.M.D., Centre for Studies in Social Sciences, Kolkata, 1983, p. 72
২. প্রতিভা বসু, সমুদ্রহৃদয়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ৭২।
৩. ঐ, পৃ. ৯৮।
৪. ঐ, পৃ. ৭৫।
৫. ঐ, পৃ. ১০৪।
৬. প্রতিভা বসু, আলো আমার আলো, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ৯৬।
৭. ঐ, পৃ. ২৪।
৮. ঐ, পৃ. ১৩।
৯. ঐ, পৃ. ১০৩।
১০. ঐ, পৃ. ১৩৯।

গ্রন্থঋণ

খাজা আহম্মদ আব্বাস, 'ভারতমাতার পাঁচ রূপ', কমলেশ সেন সম্পাদিত 'দাঙ্গা বিরোধী গল্প', রত্না প্রকাশনী, ১৯৯১, প্রথম সংস্করণ।

জীবনানন্দ সমগ্র ১ম খণ্ড, সম্পাদনা দেবেশ রায়, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রা. লি., ১৯৮৫।

শঙ্খ ঘোষ, 'সুপারি বনের সারি', করুণা প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০।

সেলিনা হোসেন, 'গায়ত্রীসন্ধ্যা', সময় প্রকাশনী, ঢাকা, অখণ্ড সংস্করণ, ২০০৩।

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উদ্বাস্তু', নবপত্র, ১৯৮৪।

হাসান আজিজুল হক, 'কথাসাহিত্যের কথকতা', একুশে, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৯।

Pranati Choudhury, A Study of the Growth and Distribution of Refugee Settlement within the C.M.D., Centre for Studies in Social Sciences, Kolkata, 1983

সুখেন্দু বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
রানাঘাট কলেজ, নদিয়া।

সূচনাপর্বে লেখা নাটকে (নির্বাচিত) সেলিম আল দীনের আত্মপথ অনুসন্ধান

ঈশিতা মণ্ডল

বাংলা নাটক প্রাচীন ও মধ্যযুগে, শুধুমাত্র সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য নাট্যসূত্রের অধীনে গড়ে ওঠেনি, লোকায়ত রুচি ও যুগধর্মের তাগিদে এর উদ্ভব—এই সত্যটিকে জনমানসে উপস্থাপন করলেন, সেলিম আল দীন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ই আগস্ট সোনাগাজী থানার অন্তর্গত সেনেরখিল গ্রামে সেলিম আল দীনের জন্ম। পিতা মফিজ উদ্দিন আহমদ ও মাতা ফিরোজা খাতুন। পিতার বদলির চাকরি ছিল, সেই সূত্রে চট্টগ্রাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রংপুর প্রভৃতি স্থানে যান। মাধ্যমিক ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গলকান্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ফেনি কলেজ থেকে এইচ এস সি পাস করেন। টাঙ্গাইলের সাদাত কলেজ থেকে স্নাতক, এম.এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে 'মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য' বিষয়ে তিনি পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন নাটককার। ১৯৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র নাট্যতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেমিল আল দীনের উদ্যোগে। যেখানে গবেষণাগারের মাধ্যমে নাট্য নির্মাণ শুরু হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে নাসিরউদ্দীন ইউসুফের উদ্যোগে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা থিয়েটার। সেলিম আল দীন ঢাকা থিয়েটারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। সেলিম আল দীন ও তাঁর সহযোগীদের মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় গ্রাম থিয়েটার। গ্রামের লোকনাট্য ঐতিহ্যকে নিয়ে গ্রাম থিয়েটার আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যতত্ত্ব বিভাগ থেকে প্রথম গবেষণাধর্মী নাট্য পত্রিকা 'থিয়েটার স্টাডিজ'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। থিয়েটার স্টাডিজ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা থিয়েটারের নতুন পথ উন্মোচিত হতে থাকে। সূচনাপর্বে লেখা নাটকে সেলিম আল দীন আত্মপথ অনুসন্ধান করেছেন। সমাজ ও জীবনের বিচিত্র বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। আমরা বর্তমান নিবন্ধে নাটককারের সূচনাপর্বে লেখা কিছু নির্বাচিত নাটক নিয়ে কথা বলব।

লিব্রিয়াম

ট্রেডিং কর্পোরেশনের হেডক্লার্ক শরীফ খানের প্রফেশনাল ও ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্র করে এই নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। শরীফ খান ও তার কলিগ, কেরানি আফজালের কথোপকথন লক্ষ করব আমরা। আফজাল—

> 'আর কি হবে। গোল হয়ে গেল শেষমেশ ভাবলাম তো হেরেই গেল মন্ত্রী দিয়ে শোধ হবে না সেও বোঝা গেল। এদিকে হাতে সময় আছে মিনিট পাঁচেক। গ্যালারি থেকে উঠে পড়লাম। ভীড় বাঁচিয়ে বাস ধরলেই লাভ। এমন সময় ফাউল কল হল। পেছন থেকে এক ছেলে বিচ্ছিরি একটা গাল দিয়ে উঠলো রেফারিকে। এমনিতেই মেজাজ খারাপ। ধমকে উঠলাম।''[১]

সংলাপ থেকে আমরা বুঝতে পারি শরীফ খান ও তার কলিগ ফুটবলপ্রেমী। খেলা দেখতে না পারার জন্য শরীফ খান আফসোস করে। ব্যক্তিগত কিছু বিষয় নিয়ে কথা শুরু হয়—

> ছেলেটার উঠল জ্বর। ডাক্তারে পথ্যে সারাটা দিন দম ফেলার ফুরসত পাই নি। প্রথম যাকে ডাকলাম তিনি হেসে বললেন ইনফ্লুয়েঞ্জা। গতকাল আরেকজন এসে জানিয়ে গেলেন নিউমোনিয়া। থার্মোমিটার দেখে আমার মাথা ঘুরে যাবার জোগাড়।''[২]

মণ্ডল, ঈশিতা : সূচনাপর্বে লেখা নাটকে (নির্বাচিত), সেলিম আল দীনের আত্মপথ অনুসন্ধান
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 2, Dec 2021, Page : 51-56, ISSN 2249-4332

কলিগ আফজালের কাছে গল্প শুনেই তিনি খেলার সাধ মেটাতে থাকেন। আমাদের পরিকল্পনা মতো সবসময় দিনের সময় অতিবাহিত করতে পারি না। এই নিয়ে মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে অহর্নিশ। শরীফ খান পারিপার্শ্বিক চাপে দিশেহারা। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের জায়গাগুলো তিনি ঠিকমত প্রকাশ করতে পারছেন না। আফজালের সঙ্গে কথা বলার পর অফিসের কাজে ডুবে যেতে থাকেন। হঠাৎ এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির ফোন আসে। ভাবনাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায় যে ফোন। ফোনে দুজনের কথা ভেসে আসে—

> ‘হ্যাল্লো! হ্যাল্লো! আশ্চর্য স্বরে কী বললেন—তাড়াতাড়ি আসবো। হাসপাতাল। কেনো। ব্লাড প্রেসারে মারা গেছে সাঈদা, সাঈদা কে। সরি রং নাম্বার। এটা হচ্ছে—রিসিভার নামিয়ে রাখেন। আশ্চর্য তো। উত্তেজনায় তাঁর মুখাবয়ব ফ্যাকাশে।”[৩]

রং নাম্বার থেকে ফোন, শরীফ খানের ভাবনা-চিন্তা পাল্টে দেয়। অফিসের টাইপিং-এর কাজে ভুল হয়ে যায়। আগে থেকে ছুটি নিয়েও দু’ঘণ্টা ওভারটাইম কাজ করতে হয়। অফিসের ডিরেক্টর ডেকে পাঠান, ভুলের জন্য শরীফ খানকে কথা শুনতে হয়। অফিস ছুটির নির্ধারিত সময়ের আগে যেন ছুটির জন্য আবেদন না করা হয়, এ নিয়ে কঠোর নির্দেশ দেন ম্যানেজার শরীফ খানকে। শরিফ খান ও তার স্ত্রীর আলাপে উঠে আসে তাদের পরিবারের চিত্র। যেমন—

> ‘সব দোষ তো আমারই। নোংরা করছো বললাম তো অমনি স্বভাবের কথা উঠে গেল। অফিস থেকে ফিরেই পাক্কা তিনটি সিগ্রেটের ছাই ঝেড়েছো মেঝেয়। ধোয়ামোছা করলে টের পেতে তবে গায় সয় কিনা।”[৪]

অফিস থেকে ফিরেই দাম্পত্য ঝগড়া শুরু হয়ে যায় তাদের। শরীফ খান ভাবতে থাকেন তার নিজের মনের খোঁজ কেউ নেয় না। যে যার মতো চাহিদা মেটাতে ব্যস্ত থাকে। তিনি আশা করেছিলেন বাড়ির সবাই তার কথা মন দিয়ে শুনবে। কিন্তু শরীফ খানের কথা শোনার মতো কেউ নেই। ছেলের শার্ট নেই, মেয়ের লন্ড্রির কাপড় আনার খরচ, এইসব মেটাতে হয় তাকে। রং নাম্বারে সাঈদা নামের একটি মেয়ের মৃত্যুর খবর আসার বিষয়টি মেয়েকে বলেন শরীফ খান। মেয়ে লিসা বাবার কথা মন দিয়ে না শুনে, তার কলেজের একটি লজিকের স্যারের একটি ছেলেকে বকা দেওয়ার কথা, ডায়াস থেকে নামার সময় সেই স্যারের হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার কথা বাবাকে শোনায়। শরীফ খান বাড়িতে নিজের মনের কথা বলতে পারেন না। বাড়ির অস্বস্তিকর পরিবেশ তার ভালো লাগে না। তিনি বাড়ির অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পার্কে যান। পার্কে এক অপরিচিত ভদ্রমহিলার সঙ্গে নিজের মনের কথা বলতে থাকেন। নানারকম বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে দুজনের মধ্যে। যেমন—ফুটবল, ক্রিকেট, রং নাম্বারে আসা ফোনের কথা প্রভৃতি। শরীফ খান জানান—

> ‘মৃত্যুসংবাদটি আমার মনের ক্ষতি করেছে। অথচ একটি অপরিচিত মৃত্যুসংবাদ। যে কেউ এর জন্য আদৌ বিচলিত না হলেও পারে।”[৫]

অথচ শরীফ খান নিজেই মৃত্যুসংবাদে বিব্রত হয়েছেন। তিনি মনে করেন মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি বোধ থেকেই এই ভাবনা আসে। শরীফ খান নিজের মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ নেন। ডাক্তার তাকে চেঞ্জে যাওয়ার পরামর্শ দেন। শরীফ খানের উত্তর—

> ‘চেঞ্জ! টাকাটা কে দেবে ডাক্তার। আমার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ঘুম। কালকের এক্সপ্ল্যানেশনের ভয়—স্ত্রীর চিৎকার—খোকার কান্না থেকে বাঁচতে—আমার ঘুমিয়ে যাওয়া দরকার। চেঞ্জের কথা বলছেন—সামর্থ্য নেই। তাছাড়া আপিস থেকে ছুটি—সে একদম অসম্ভব।”[৬]

ডাক্তারবাবু পরামর্শ দিচ্ছেন শরীফ খানকে একা থাকতে। কিন্তু সংসারের যাবতীয় দায় উপেক্ষা করে তার পক্ষে একা থাকা সম্ভব নয়। সংসারের জটিলতায় তিনি পিষ্ট হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। ডাক্তারকে বলছেন—

> ‘কি করে বোঝাবো ডাক্তার আমি কি করে বোঝাবো। এই মুহূর্তে আমার যে কি ভীষণ ইচ্ছে করছে—একা থাকতে—আমি একা থাকতে চাই—লিসা—খোকা সবার কাছ থেকে। কেননা আমার আর কিছুর প্রয়োজন নেই—ফুটবল খেলা দেখার দুঃখ—কিংবা চিঠির ভুল আর এক্সপ্লানেশনের ভয়ের জন্য কারো সহানুভূতি আমার চাই না ডাক্তার। আমি একটু ঘুমাতে চাই।”[৭]

ডাক্তার একটা ওষুধ দেন, লিব্রিয়াম নামের। লিব্রিয়াম হলো ঘুমের ওষুধ। ডাক্তার জানায় খোকার কান্না কিংবা স্ত্রীর চিৎকার কিছুই শরীফ খানের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না। নাটকটি শেষ হয় শরীফ খানের আবেগতাড়িত কথায়—

> ‘মাত্র পনেরো টাকা। দরজা পর্যন্ত ক্লান্ত এবং ভারী পদক্ষেপে এগিয়ে যান। সহসা একটু ঘুরে অভিবাদনের ভঙ্গিতে আসি। সত্যি তাহলে আজ ঘুমাতে পারবো—তাই না। একপা একপা করে অদৃশ্য।”[৮]

একটু নিশ্চিন্তে ঘুমানোর জন্য মানুষের করুণ আর্তি চোখে পড়ার মতো। নাটকটিতে কোন দৃশ্য বিভাজন নেই। পড়তে পড়তে পাঠক বুঝে যাবে কীভাবে দৃশ্যগুলো একের পর এক পাল্টে যাচ্ছে। অফিসরুম থেকে বাড়ি, বাড়ি থেকে পার্ক, পার্ক থেকে ডাক্তারের চেম্বার। এক ব্যক্তি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আমরা নাটকটিতে খুঁজে পাব। কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত জীবন মানুষকে ভারসাম্য রেখে চলতে হয়। দৈনন্দিন যাপনের টানাপোড়েনে বিধ্বস্ত হতে থাকে মানুষ। একটু ভালো থাকার চেষ্টা করে যায়। শরীফ খানের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নাটককার, মানুষের জীবনের ধ্রুবসত্যকে ইঙ্গিত করেছেন। নাটকটির নাম লিব্রিয়াম। নাটকটির পরিণতিতে দেখি আমরা ঘুমের ওষুধ পেয়ে নিশ্চিন্তে একটু ঘুমোতে চেয়েছেন শরীফ খান।

অনিকেত অন্বেষণ

নাটকটি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে আহসান হাবীব সম্পাদিত—‘দৈনিক পাকিস্তান’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শুরুতেই আমরা দেখব মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটের সজ্জা। মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসন ব্যবস্থার মোড়কে নাটককার নাটকের কাহিনি উপস্থাপন করেছেন। রাজপ্রাসাদের মন্ত্রণা কক্ষে চলছে প্রধানমন্ত্রী খাজা জাহান ও মালিক কবিরের মন্ত্রণা। বিভিন্ন সময়ে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক নানাবিধ ফরমান জারি করেন। দিল্লির নাগরিকেরা কেউই চায় না রাজধানী দিল্লি থেকে দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত হোক। অস্ত্র ব্যবসায়ীদের ওপর ফরমান জারি করেন। বেনামী একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে আলাপ চলতে থাকে। ইতিহাস বারবার জানায় আমাদের রাজা কিংবা সম্রাটদের স্বজনরাই তাদের সিংহাসনের পতন ডেকে আনে। এই নাটকেও বাহাউদ্দিন যিনি মহম্মদ বিন তুঘলকের রক্তের সম্পর্কের তিনি বিদ্রোহ করেছেন সম্রাটের বিরুদ্ধে। সম্রাট থেকে শাস্তি দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সম্রাজ্ঞী রক্তের সম্পর্কের কথা বারবার সুলতানকে স্মরণ করিয়ে দেন। বাহাউদ্দিনকে শাস্তির জন্য রাজসভায় আনা হলে, সুলতানের প্রতিক্রিয়া—

> ‘বাহাউদ্দিন—আমি ইচ্ছে করলে এ মুহূর্তে তোমাকে ক্ষমা করে দিতে পারি। .... মুখে একটা অবহেলার হাসি ফুটে উঠে কিন্তু আমি তা করবো না—কারণ তোমার যন্ত্রণায় আমার কিছু যায় আসে না। সামনের দিকে এগিয়ে আসেন এবং চিৎকার করে কিছু আসে যায়। মনে করো চামড়া খুলে নেওয়ার আদেশ দিলাম জ্যান্ত চামড়া।”[৯]

সুলতানের এই ঘোষণায় বাহাউদ্দিন চিৎকার করে ওঠে। সুলতান খাজাকে আরও একটি বিষয় জানিয়ে দেন—

> ‘দেখুন তিনদিনের ভেতর দিল্লির রাস্তায় একটা ভিখারি পেলেও ক্ষমা করা হবে না। হাত-পা বেঁধে চলন্ত গাড়ির পেছনে টেনে নতুন রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হবে। লিখুন।”[১০]

মহম্মদ বিন তুঘলকের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা মানুষকে পর্যুদস্ত করতে থাকে। সুলতানের ঘোষণায় সভায় উপস্থিত সবাই স্তম্ভিত হতবাক হয়ে পড়ে। সূর্য ডোবার আগে বাহাউদ্দীনের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে সুলতান। দিল্লির

জনশূন্য রাজপথ। সুলতানের অত্যাচারে মানুষ দিশেহারা। দৌলতাবাদের দিকে মানুষ ছুটে চলেছে, যেন ঘোড়দৌড় চলছে। দিল্লি যেন শ্মশান পুরীতে পরিণত। মানুষের পিছনে সৈন্যদল চলেছে, যারা সুলতানের নির্দেশ অমান্য করবে তাদের কোতল করে দেবে। পথচারীরা সুলতান সম্পর্কে মন্তব্য করে—

'সবাই বলে সুলতানের মতিভ্রম হয়েছে। আমি বলি শয়তানি চেপেছে ঘাড়ে আস্ত একটা জল্লাদ।'[১১]

সুলতানের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের ৬টি জায়গা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সৈন্য সংখ্যা বাড়াতে হবে। প্রচুর খরচ আছে এই নিয়ে মালিক কবীর, বারানি ও ওমরাহদের মধ্যে পরামর্শ চলে। সুলতান চিন্তিত হয়ে বলেন—

'কিন্তু সমস্যা তো ওয়ালিদের নিয়ে নয়। রাজকোষের অর্থ ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এর সমাধান চাই। দোয়াবে দশ গুণ কর অর্থের জন্য বসানো হয়নি। সুতরাং লাভের হিসেবও অনর্থক। বিদ্রোহীদের ভালো-মন্দে আমার কী দায়ভাগ।'[১২]

বারানি সুলতানকে পরামর্শ দেয় করের মাত্রা বাড়ালে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাবে বরং ওয়ালিদের কাছে থেকে অর্থ নেওয়া হোক। রাজকোষের অর্থ ঘাটতি মেটানোর জন্য সুলতান টাকা-পয়সার ক্ষেত্রে একটি নতুন নিয়ম আনার কথা বলেন। অর্থাৎ সাম্রাজ্যের যে প্রচলিত রূপোর টাকা আছে, তার পরিবর্তে তামার টাকা নিয়ে আসতে হবে। রূপোর টাকাগুলো অকেজো হয়ে যাবে। সুলতান বলেন—

'এটা একটা অভ্যাস মাত্র। সংস্কার। শুধু চীনে কেন—মোঙ্গলদের মধ্যেও এরকম টাকা চালু আছে।—বলেছি সোনা-রূপা তামা একটা প্রবল বিশ্বাস মাত্র। তাছাড়া বাস্তব প্রয়োজন দুটোতেই মেটে। এই মুহূর্তে আমাদের অর্থ ঘাটতি। এই পন্থা বেছে নিলে সহজেই প্রয়োজন মেটে। সৈন্যসংখ্যা ইচ্ছামতো বাড়ানো যাবে।'[১৩]

বারানি অন্য মত দিতে চাইলেও সুলতান তা শোনে না। নিজের মন্তব্যে অনড় তিনি। জনসাধারণের সুখ-দুঃখের কথা তিনি ভাবছেন না। তিনি মজা দেখছেন মানুষকে বিপর্যস্ত করে। সিংহাসন তথা রাষ্ট্রশক্তি কীভাবে মুহূর্তের মধ্যেই তামার টাকাকে রূপোর টাকা, রূপোর টাকাকে তামার টাকা করে দিতে পারে। সিংহাসনের ক্ষমতা প্রদর্শন করতে তিনি ব্যস্ত। দিন তিনেকের মধ্যেই দিল্লিকে কবরখানা করে দেন। বারানি আশঙ্কিত হয়, সুলতানের এই নির্দেশ জারি হলে সাম্রাজ্যবাদী বিদ্রোহ শুরু হবে। তামার টাকার নির্দেশ জারি হওয়ার পর থেকে স্বর্ণকারদের মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হয়। বাসনপত্র গলিয়ে টাকা বানাতে শুরু করে তামা দিয়ে। তাদের মনেও আশঙ্কা দেখা দেয়, বিদেশী বণিকরা সুলতানের মুখের ওপর বলেছে তামার টাকা তারা নেবে না। বাটপাড় ও স্বর্ণকারের মধ্যে চুক্তি হয় নকল টাকা বিনিময়ের। সুলতানের নির্দেশে কেউ লাভবান হয়, আর কেউবা না খেতে পেয়ে মারা যায়। সাম্রাজ্যের ৮টি জায়গায় বিদ্রোহ শুরু হয়। কবীর চিন্তিত হয়ে পড়ে। জনপ্রিয় ওয়ালিদের কোনও প্রদেশ থেকে সরালে গেলে তারা বিদ্রোহ করছে। মহম্মদ বিন তুঘলকের সৈন্যদের তলোয়ারে জং ধরে না, এমন প্রবাদ প্রচলিত ছিল সেই সময়। তামার টাকার প্রচলনের জন্য সাম্রাজ্য জুড়ে বিদ্রোহ শুরু হয় ব্যাপক। কবীর জানায়—

'বিরুদ্ধবাদী আর নকলবাজদের হাতির পায়ের নিচে পিষে দিয়েছি তবু যা হবার তাই হল। আমরা কেউ ঠেকাতে পারিনি। বারানি ছিলেন তামার টাকার সবচেয়ে বড় সমালোচক। তাঁকে ধমক দিয়ে সেদিন তাঁর মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলাম।'[১৪]

তামার টাকা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। সুলতান সবাইকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেন। সুলতান মাদুরাই যুদ্ধ করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সৈন্য প্রস্তুত হয়, মালিক হুসাংকে দৌলতাবাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে যান। মাদুরাইতে আবহাওয়া মোটেও ভালো ছিল না। ৫০ হাজার সৈন্যকে নিয়ে সুলতান মাদুরাই যাওয়ার ঘোষণা করে আহসানের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করার জন্য। প্রথম, দ্বিতীয় ওমরাহ নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় ব্যস্ত। সম্রাট কিছুদিন আগেও হুসাংকে ওয়ালির পদ দেননি তাকে হঠাৎ করে রাজধানীর শাসনকর্তা নিয়োগ করলেন। বিষয়টি নিয়ে তারা

চিন্তিত হয়। মাদুরাই পৌঁছাতে না পেরে সুলতানের মারা যাওয়ার খবর রটে যায়। ওমরাহদের আলাপ থেকে সুলতান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। সুলতানের এমন পরিণতি তারা আশা করেছিল। মহামারীতে অর্ধেক সৈন্য মারা যায়, প্রজাদের কথায় কথায় খুন করার সিদ্ধান্তের যোগ্য শাস্তি পায় সুলতান। এই ঘটনা থেকে সহজে বোঝা যায়, এমনকি ইতিহাসও এই হিসেব আমাদের দিয়ে এসেছে, সুলতান রাজাদের কাছের লোকই অর্থলিপ্সার জন্য শত্রুতা করে। মালিক হুসাং সুলতানের কাছের লোক ছিল। সেই শেষ পর্যন্ত আত্মসাৎ করলো রাজ্য। কবীর ও বারানী সুলতানের দুই পরামর্শদাতা নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতা করে। বারানী জানায়—

> 'ইতিহাস একটা জায়গায় ভাবীকালের জন্য থামিয়ে দেয় চলতি কালের যুদ্ধের ঘোড়া। অনেক কিছুই মানুষের ক্ষমতার বাইরে। হঠাৎ মহামারীতে অর্ধেক সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এদিকে নতুন করে সৈন্য জোগাড় যখন করলেন তখন মালিক হুসাং। বিদ্রোহ করেছে।''[১৫]

মালিক কবীর। সুলতানকে দৌলতাবাদে ফিরে যাওয়ার কথা বলে। সুলতান রাজি হয় না। এমনকি বন্দী হুসাংকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত জানায়। বেগমের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় সুলতানের কথায় বিষাদ সুর লক্ষ্য করা যায়। বেগম বারবার দৌলতাবাদে ফিরে যাওয়ার কথা বললেও সুলতান তার সংগ্রামী চেতনা বজায় রাখে, ফিরে যেতে চান না। তিনি বলেন বেগমকে—

> 'তোমার চুল পাকছে—আমারও। আমরা দুজন বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। .... এই মুহূর্তে আমার পেশিতে কি তোমাকে বোঝাতে পারবো না।''[১৬]

এই অংশে আমরা দেখতে পাব সৈন্যদের মধ্যে কথোপকথন। একটি প্রকাণ্ড মাছকে কেন্দ্র করে সবাই অস্থির। কোনওদিন এই প্রকাণ্ড মাছ কেউ দেখেননি। মাছকে, নাটককার এখানে রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। মাছের সঙ্গে সুলতানের তুলনার জন্য। এই অংশে আমরা দেখতে পাই সুলতান ও বারানির আলাপ। সুলতানের মন ঠিক করার জন্য সবাই জলসার আয়োজন করার কথা বলে। সুলতান রাজি হন না। একাকী থাকতে চান। বারানি থাকতে চাইলে সুলতান তাকে জানান—

> 'ইতিহাস অপেক্ষা করে না নিরবধি বয়ে চলে।''[১৭]

প্রকাণ্ড মাছ নিয়ে কথা চলে বারানি আর সুলতানের মধ্যে। জানা যায় মাছটি ছোট ছোট মাছদের খেতে গিয়ে নিজে মারা পড়েছে। সুলতান যেন মাছটির প্রতীকে নিজেকে দেখতে পান। বেগম সুলতানের পাশে এসে দাঁড়ায় অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনাকে ভুলে যেতে বলে। সুলতান সান্ত্বনা চাননা। নিজের স্বগোতোক্তি—

> 'আমি কি সেই অদ্ভুত মাছটি নই। দয়া করে আমাকে একা থাকতে দাও। আমি বড় ক্লান্ত। একা থাকতে দাও আমাকে। আমি একা থাকতে চাই—এইসব যায় একাকী—তুমি যাও—যাও।''[১৮]

এখানেই নাটকটির পরিসমাপ্তি। 'অনিকেত অন্বেষণ'—নাটকটিতে আমরা দেখলাম ইতিহাসের রক্তক্ষয়ী অধ্যায়। ক্ষমতার দম্ভ অত্যাচারের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে। ইতিহাসবিদ আল বিরুণীর কথা আছে নাটকটিতে, এখানে তিনি বারানি নামে পরিচিত। ইতিহাসকে কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করে মানুষের জীবনকথা আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন নাটককার। দিল্লি থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তর, তামার নোট প্রচলন, অকারণ যুদ্ধ, দুর্যোগে সৈন্যদের প্রাণনাশ, নিজের ব্যক্তিগত সহচরদের বিশ্বাসঘাতকতা, বিন তুঘলককে নিঃসঙ্গ করেছিল। আমরা ইতিহাসে তার কথা পড়ি। কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবন আমাদের কাছে অধরা। নাটককার কল্পনার মধ্যে দিয়ে মহম্মদ বিন তুঘলকের ব্যক্তিজীবনের সত্যটিকে একটা রূপদান করেছেন। দম্ভ, মানুষের উপর নির্বিচারে দমন-পীড়ন, কিভাবে সুলতানকে দিশেহারা নিঃসঙ্গ করে তুলল। আমরা জানি মনুষের কর্মই তার পথ চলা ঠিক করে। কর্মের ফল মানুষ জীবনে পেয়ে যায়। স্বৈরাচারী শাসকের নিষ্ঠুর পরিণতি আমরা দেখলাম। নাটককার আমাদের বার্তা দিলেন, পাপের ফল কখনো পুণ্য হতে পারে না। সুলতানেরও বোধোদয় হয় শেষ পর্যন্ত।

OPEN EYES
ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ এভাবে নাটকটির দৃশ্য সাজানো হয়েছে। কোনও গান বা কবিতা নাটকটিতে নেই। বাক্যে পূর্ণযতি আর অর্ধযতি ব্যবহার করা হয়েছে। বাক্যে যতি চিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কমা, সেমিকোলন জিজ্ঞাসা চিহ্ন, বিস্ময়বোধ চিহ্নের পরিবর্তে ছেদ ও অর্ধযতি ব্যবহার করলেন। সেলিম আল দীনের নাটকগুলি পাঠ করলেই যতি চিহ্ন ব্যবহারের এই রীতি লক্ষ্য করা যাবে। নাটকের দৃশ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে স্বর্গ বিভাজন রীতি দেখা যায়। তাঁর নাটকে আছে মহাকাব্যিক বিস্তার।

বর্তমানে ঢাকা থিয়েটার, স্বপ্নদল নাট্য সংগঠন প্রভৃতি সেলিম আল দীনের নাট্যদর্শন থেকে নাট্যনির্মাণ করছে। পশ্চিমবঙ্গেও সেলিম আল দীনের নাট্যদর্শন নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের পাঠক্রমে সেলিম আল দীনের নাট্যদর্শন পড়ানো হয়।

তথ্যসূত্র

১. সাইমন জাকারিয়া (সংক.), সেলিম আল দীন রচনা সমগ্র (১), ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, জুলাই ২০০৫, পৃ. ১৫।
২. তদেব, পৃ. ১৬।
৩. তদেব, পৃ. ১৬।
৪. তদেব, পৃ. ২০।
৫. তদেব, পৃ. ২৭।
৬. তদেব, পৃ. ৩১।
৭. তদেব, পৃ. ৩১।
৮. তদেব, পৃ. ৩২।
৯. তদেব, পৃ. ৩৮।
১০. তদেব, পৃ. ৩৮।
১১. তদেব, পৃ. ৩৯।
১২. তদেব, পৃ. ৪০।
১৩. তদেব, পৃ. ৪১।
১৪. তদেব, পৃ. ৪৯।
১৫. তদেব, পৃ. ৫৬।
১৬. তদেব, পৃ. ৫৬।
১৭. তদেব, পৃ. ৫৭।
১৮. তদেব, পৃ. ৫৮।

ঈশিতা মণ্ডল,
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড

Sustainable Development Goals, MGNREGS and Social Audit : A Case of Rural West Bengal

Somnath Bandyopadhyay

Abstract

As a part of UN community India has a fundamental role in shaping Sustainable Development Goals (SDGs) and its national development agenda is also mirrored in the same. The MGNREGA, 2005 as one of its national agenda having multiple objectives of poverty eradication, rural employment generation, rural asset creation, social inclusion etc. have lot of potentials to achieve the SDGs. The unique feature of the Act, which makes it different from previous welfare programmes is that it itself contains the provision of mandatory biannual social audit to ensure transparent and successful implementation of the scheme. On the basis of primary data collected from selected gram panchayats of the district Malda and Hooghly of West Bengal it has been found that participation at the social audit meeting of the beneficiaries has significant positive bearing upon their awareness level, however some other socio-economic factors like level of education, economic status etc. also play significant influential role for achieving the same. Our secondary data also confirms that awareness of the beneficiaries is one of the key requirements for success of the scheme and hence it has been found that participation at the social audit meeting of the beneficiaries of the MGNREGS has significant positive effect on the achievement of SDGs in rural West Bengal.

Key words: SDGs, MGNREGS, Social Audit, Awareness Level, Beneficiaries.

I. Introduction:

The global community, through the United Nations, has set a historical roadmap, ‘Sustainable Development Goals (SDGs)’, which aims to build a more prosperous, more equal and more secured World by 2030. The 2030 Agenda and its 17 SDGs with 169 targets, adopted in 2015 by 193 countries, provide a coherent and holistic framework for addressing the problems that have endured through the past decades and reflects our evolving understanding of the social, economic and environmental linkages that define our lives. According to their definition, Sustainable Development is a combination of five Ps, contains a plan of action for people, planet, prosperity, peace and partnership (United Nations, 2015). It recognizes that alleviation of poverty including extreme poverty is the greatest global challenge and an indispensible requirement for Sustainable Development. India has a fundamental role to play in shaping the SDGs and the country’s national development agenda is mirrored in the SDGs (KPMG, 2017).

Bandyopadhyay, Somnath : Sustainable Development Goals, MGNREGS and Social Audit : A Case of Rural West Bengal

Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 2, Dec 2021, Page : 57-80, ISSN 2249-4332

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act[1], 2005 (hereinafter called MGNREGA) is one of such national agenda, have multiple objectives of eradication of poverty by employment generation, rural asset creation, social inclusion and financial inclusion (Mishra & Puri, 2009). It is based on employment guarantee scheme the MGNREGS, the primary objective of which is to ensure the transfer of a minimum income to rural households through self-seeking wage employment. It may be identified as a significant departure from the former employment and public works programmes, which were designed to create community infrastructure first and then simultaneously generate income and employment to local residents. It ranks among the most powerful initiatives ever undertaken for transformation of rural livelihood (Ambasta, *et.al.*, 2008). The unique feature of the scheme, which makes it different from others is that unlike the previous rural employment generation schemes, it provides a legal right and guarantee for employment for people living in rural India and a complete mechanism to ensure that right. More importantly, the act exalts the position of the citizens from the receivers of state's dole to a legally entitled shareholder in the development pie, irrespective of the size of pie (Pankaj, 2012). Moreover the scheme has lot of potentials to meet as many as nine Sustainable Development Goals viz. Goal 1,2,3,5,6,8,10,13,15,16 (Niti Aayog, 2018). A detail list of Sustainable Development Goals, which may be achieved by the scheme is given in table 1.

Table 1: Linkage between the MGNREGA and Sustainable Development Goals

Sl.no.	Features of the MGNREGA	Sustainable Development Goals	
1.	Eradication of rural poverty	SDG-1	End poverty in all its forms every where
		SDG-2	End of hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
		SDG-3	Ensure healthy lives and promote well being for all at all ages.
		SDG-10	Reduce inequality within and among countries.
2.	Eradication of rural unemployment	SDG-3	Ensure healthy lives and promote well being unemployment for all at all ages.
		SDG-8	Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.
		SDG-10	Reduce inequality within and among countries.
3.	Rural asset creation	SDG-6	Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.
		SDG-13	Take urgent action to combat climate change and its impacts.
4.	Social inclusion	SDG-3	Ensure healthy lives and promote well being for all at all ages.
		SDG-10	Reduce inequality within and among countries
		SDG-8	Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.
		SDG-16	Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all level.
5.	Women empowerment	SDG-3	Ensure healthy lives and promote well being for all at all ages.
		SDG-5	Achieve gender equality and empower all women and girls
		SDG-10	Reduce inequality within and among countries
		SDG-8	Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.
		SDG-16	Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all level.
6.	Environmental protection	SDG-13	Take urgent action to combat climate change and its impacts.
		SDG-15	Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystem, sustainably manage forests, combat desertification and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss.

Source: United Nations (2015), KPMG (2017) and Niti Aayog (2018).

In spite of such importance, it is also fact that corruption is eating into the vitality of our society. To root it out we need strong provisions (Aakella & Kidambi, 2007). Considering this reality, the Act itself contains provisions for ensuring the right to rural households to actively participate in the monitoring the effectiveness and transparency of the implementation by means of biannual mandatory social audit. It facilitates the rural people to reach at desired awareness level about the different aspects of the scheme like fund sanctioned, projects taken up, muster rolls, job cards, etc. Such awareness is one of the necessary preconditions for successful implementation of the scheme (Mukherjee & Ghosh, 2009).

Thus, an attempt has been made in this paper to find out effect of the Participation at the Social Audit on the Awareness Level of beneficiaries of the scheme in rural West Bengal on the basis of primary data collected from four selected Gram Panchayats. Divided in five sections, in section II, we have highlighted our review of literature. The objective and methodology of the study have been discussed in section III, our findings and analysis of the same have been explored in section-IV and finally in section V we have made some concluding observations.

II. Review of existing literature :

We may note that the mandatory requirement for social audit under the MGNREGA is an innovative measure aimed at ensuring transparent implementation of scheme towards achievement of Sustainable Development Goals by means of enhancing the awareness level of beneficiaries and people at large. There are also few studies on the issue of effectiveness of the social audit in general and its effects on the MGNREGS in particular.

Shah and Ambasta (2008) and Aiyar and Samji (2009) observed that implementation of institutionalized social audit in their respective study areas have ensured successful implementation of the MGNREGS. However, they also apprehended that since the social audit is post-facto exercise there may be some loopholes even after its successful implementation.

National Institute of Rural Development (NIRD) (2008) on the basis of evaluation of impact of the MGNREGS in Odissa pointed out that implementation of the scheme in the State has not been reached at desired level due to existence of lot irregularities in the same.

On the basis of primary data Shankar (2010) has found that though social audit is a novel method to engender on the part of public officials, in reality it suffers from lot of pathologies. According to their opinion social audit should be viewed as a tool for yielding substantial results towards transparent implementation of the MGNREGS rather than only a simple procedural compliance.

Similarly, Singh and Vutukuru (2011) have found that social audit reports of the MGNREGS generate lot of information that can possibly be missed in quantitative performance benchmarks and therefore is an important tool to gauge the success of the programme.

Vij (2011) on the basis of secondary data observed that the system of social audit in the

MGNREGS has full potentials to ensure capacity building and empowerment of marginalized groups of the society. He also argued that effectiveness of social audit can only be achieved with strong institutional support like Andhra Pradesh, Rajasthan.

On the basis of secondary data Reddy (2013) has argued that Andhra Pradesh is the unique state where social audit process has been institutionalized through an autonomous State unit which makes a huge difference to the quality of governance of the programme.

Afridi and Iversen (2013) conducted a study on the social audit of the MGNREGS in the state of Andhra Pradesh. Their findings of the survey indicate no significant effect of the repeated social audit process on reducing the aggregate number of complaints. Such detection is made harder both by the fact that social audits were not implemented randomly and by the type of information (complaints) recorded by the social audit team.

Rajashekar, *et. al.* (2013) on the basis of study on the effectiveness of the social audit of the MGNREGS in the state of Karnataka observed that the social audit process at the GP level was marked by many constraints and problems. While all the GPs conducted social audits their capacity to undertake audits effectively was compromised by the influence of village elites.They also found that there was significant structural conflict of interest between cultivators who employed agricultural labour and the labourers who were seeking additional work under MGNREGS to supplement their income.

The Centre for Wage Employment and Poverty Alleviation (CWEPA) (2014) on the basis of their field visit 0explored some important facts about the organization of social audit of the MGNREGS in the State of West Bengal, e.g. The department of Panchayat and Rural Development in the state seems to be over burdened with their own task and without any extra staff at their disposal finds it virtually impossible to handle, mentor or monitor the processes happening in the districts.

Bandyopadhyay (2015) on the basis of secondary as well as primary data has found that in West Bengal there is positive association between participation at social audit meeting and the awareness level of the beneficiaries of the MGNEREGS and such awareness has also positive effect on the performance of the scheme.

Fox (2015) has argued that social audit can be identified as significant tool to break the low accountability traps by triggering the virtuous circle in which the citizens can exercise their voice, which in turn trigger and empower reform resulted in more voice. He used secondary data for that purpose.

From aforesaid review of literature, it may be revealed that systematic implementation of the radical provision of the MGNREGA relating to mandatory biannual social audit is the necessary pre condition for ensuring transparent implementation of the scheme. In this respect the role of gram panchayat is very important. Moreover, social audit of the MGNREGS is aimed at enhancement of the awareness level of the beneficiaries about their entitlements. So far as our review of literature is concerned there are very few studies about the said issue in context of rural West Bengal.

III. Objective and Methodology:

The objective of this paper is to find out:

1. Effect of the Participation at the Social Audit Meeting at *gram sabha* on the awareness level of the MGNREGS beneficiaries in rural West Bengal;
2. Whether there is any other factors, which may have influential effect on their awareness level.

The paper is based on secondary as well as primary data. For the purpose of secondary data, we have consulted different literature available in different books, published reports, articles available in different Indian as well as International Journals, working papers and web pages. For the purpose of collection of Primary Data, we have purposively selected two districts of West Bengal viz. Malda and Hooghly. The former is situated at the northern part of the state and later is situated at the southern part of the state. From Malda we have purposively selected two Community Development Blocks[2] of the district namely Englishbazar and Habibpur. From Englishbazar we have selected two gram panchayats namely Binodpur and Fullbaria and from Habibpur we have also selected two gram panchayats namely Bulbulchandi and Baidyapur. Similarly, from Hooghly we have selected two Community Development Blocks namely Tarakeswar and Chanditala-II. From Tarakeswar we have selected Kesabchak and Balgori-I Gram Panchayat for our study. Again from Chanditala-II we have selected Barijhati and Janai Gram Panchayat for our study. The socio-economic profile of the selected gram panchayats of Malda may be highlighted in table 2.

Table 2 : Socio-economic Profile of the Selected Gram Panchayats of the District Malda

(Unit : Number)

Block	**Habibpur C.D. Block**		**Englishbazar C.D. Block**	
Gram Panchayat	Bulbulchandi	Baidyapur	Fulbaria	Binodpur
Total Population	25119	27926	14238	18252
SC	9144	19713	2960	4004
ST	4647	6227	76	365
Others	11328	1986	11202	13883
Total Households	6565	6488	2903	3916
Landless Households	4870	2931	2081	2150
BPL Household	4560	4338	1810	1690
AAY Household	2107	1794	568	541
Agricultural Labour	4118	3247	2036	2362
Marginal Farmer	1154	2743	604	1063
Small Farmer	336	520	157	542
Woman Headed	795	402	194	239
MGNREGS Job card Holders	6721[$]	5441	2518	4458[#]
Registered workers under MGNREGS	14106	13029	5477	8145
Number of active Job cards	4845	3534	1711	2785
Active Workers	7204	6348	2372	3711
Women	2726	2636	1039	1535
SC	2858	3125	277	409
ST	1743	1495	0	7
Others	2603	1728	2095	3295

Note :

$- Panchayat Officials did not agree to furnish all the relevant information about the Gram Panchayat. As a result we had no alternative but to collect that information from other sources such as, West Rural Household Survey, Census of India etc. Subsequently we have found that total number of job cardholders is more than total number households, which puts question about the transparency in issue of jobcards in those Gram Panchayats. This also substantiates findings of NCAER-PIF(2009), 'A Study on Evaluating Performance of National Rural Employment Guarantee Act', *National Council of Applied Economic Research*, New Delhi.

#-op.sit.

Source : GP Survey, GOWB(2005) and official website of the MGNREGA www.nrega.nic.in.

Similarly socio-economic profile of selected gram panchyats of Hooghly may be highlighted in table 3.

Table 3 : Socio-economic Profile of the Selected Gram Panchayats of the District Hooghly

(Unit : Number)

Block	Tarakeswar C.D. Block		Chanditala-II C.D. Block	
Gram Panchayat	Keshabchak	Baligori-I	Barijhati	Janai
Total Population	12905	14492	16,163	16,000
SC	5160	5217	2973	1920
ST	1302	1739	65	140
Others	6443	7536	13125	13940
Total Households	3061	4721	4017	3723
Landless Households	1682	3294	3164	2219
BPL Household	1311	772	1044	691
AAY Household	566	216	463	275
Agricultural Labour	1435	2465	1500	714
Marginal Farmer	1132	1016	464	642
Small Farmer	188	318	270	20
Woman Headed	129	124	225	175
MGNREGS Job card Holders	3000	3962	1377	575
Registered workers under MGNREGS	6598	7087	2410	1328
Number of active Jobcards	2849	3063	662	307
Active Workers	4125	4710	739	396
Women	1580	2067	261	201
SC	1470	1720	302	206
ST	499	720	0	0
Others	2156	2270	437	190

Source: Op.sit.

From each of the gram panchayats we have selected 25 beneficiaries[3] of the scheme, who actively avail the job. The socio-economic profile of thse selected beneficiaries of two districts is given in table 4.

Table 4: Socio-economic Profile of the selected beneficiaries of the district Malda and Hooghly

Districts / Parameters	Malda (%)	Hooghly (%)
Education level		
Illiterate	31	21
Primary level	32	26
Secondary level	30	31
Above secondary level	7	22
Caste Profile		
ST	5	16
SC	44	35
Others	51	49
Gender Profile		
Female	41	42
Male	59	58
Occupation		
Agriculture labour	58	41
Small &Marginal farmer	32	28
Occupation		
Domestic service	6	21
Others	4	10
Economic Status		
AAY	26	12
BPL	63	26
Others	11	62

Source: Primary survey.

We interviewed those selected beneficiaries with structured questionnaire and recorded their responses in the same. The questionnaire contained close ended questions about nine (9) different stages of implementation of the MGNREGS[4], which have some vulnerabilities in course of the implementation(National Consortium for Civil Society Organizations on NREGA,2009) and about which awareness on the part of the beneficiaries are very important for enforcing their rights as enshrined in the Act and which may be significantly affected by their active participation at the social audit meeting at *gram sabha*.

For the purpose of analysis of those collected data we used simple statistical tools viz. Arithmetic Mean, Kerl Pearson's Product Moment Correlation Coefficient and for the purpose of testing the significance of the results we applied student's't' test and Fisher's 't' test.

IV. Findings from the Primary Survey and Analysis of Data

In our previous section we have discussed about the methodology for collection of primary data. Now in this section we proceed to explore our findings and analysis of data derived from the same.

A. Findings from the Primary Survey:

At the first stage we have presented the collected data from selected gram panchayats of selected blocks of the district Malda in table 5 :

Table 5: Primary Data on the Awareness Level (AL) and Participation at Social Audit Meetings (PSAM) at *gram sabha* in Malda District.

Unit : Percentage

Name of the Block	Habibpur C.D. Block		Englishbazar C.D. Block	
Gram Panchayat	Bulbulchandi	Baidyapur	Fullbaria	Binodpur
Regarding the Act	39	50	52	71
Issue of Job card	56	67	67	67
Application for Job	79	72	83	96
Selection of Projects	27	32	34	44
Development and approval of technical estimate	0	0	0	0
Allotment of work	50	50	93	25
Implementation and supervision of work	0	0	12	0
Payment of wages	56	58	75	75
Social Audit Meeting at gram *sabha*	62	100	40	100
Overall awareness level	38	44	47	50
Average number of Social Audit Meeting attended*	2	7	2	6

Note:*- In number.
CD means community development
Source : Data calculated from primary survey.

1st column of the table 5 shows that the selected beneficiaries of Bulbulchandi Gram Panchayat under Habipur CD Block on an average attended only 2 social audit meeting till the date of the survey, which reveals their very poor participation at social audit. Regarding their awareness level it has been found that in some cases viz. issue of job card, application for job, payment of wages, and social audit meeting their position is satisfactory. However, in other cases same is not satisfactory at all. Their overall awareness level stood at 38% as on the date of survey.

On the other hand, 2nd column of the table depicts that selected job card holders of Baidyapur Gram Panchayat under Habibpur CD Block participated at 7 social audit meetings till the date of the survey. Their awareness level in some aspects viz., issue of job card, application for job, payment of wages, social audit meeting at *gram sabha* stands at satisfactory level as on the date of the survey. In contrast, their awareness level in other aspects like development and approval of technical estimates, implementation and supervision of works is not satisfactory at all. Their overall awareness level stood at 44% as on the date of survey. We have presented a figure showing comparisons of the two GPs under Habibpur CD Block in respect of the level of awareness and participation of the job card holders in the figure 1.

Figure 1 : Comparison of the two GPs (Bulbulchandi and Baidyapur) under Habibpur CD Block in Malda in respect of the Level of Awareness and Participation of the beneficiaries

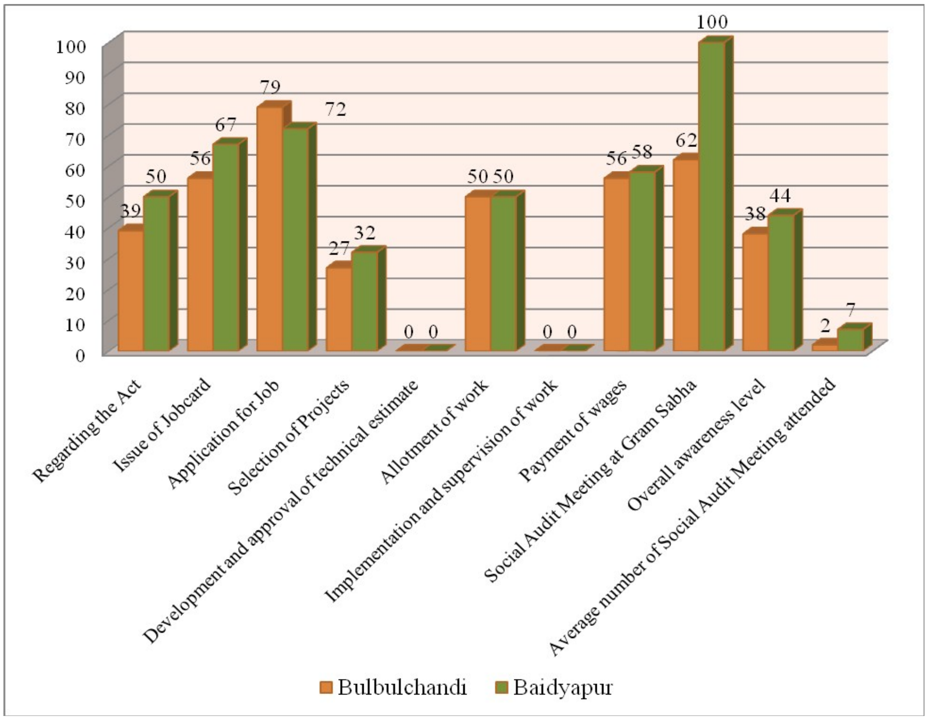

Source: Data calculated from primary survey.

Again, 3rd column of the table 5 shows the position of the selected job card holders of Fullbaria Gram Panchayat (best GP) under Englishbazar CD Block regarding their participation in social audit meeting at Gram *Sabha* as well as their awareness level about different aspects of the MGNREGS. It shows very poor participation of beneficiaries at the social audit meeting. In spite of the fact that their awareness level in some important aspects viz. the Act itself, issue of job card, application for job, allotment of work, payment of wages are satisfactory. But the same is not true in other cases like selection of projects, implementation and supervision of work etc. The overall awareness level of the beneficiaries was only 47%.

Lastly 4th column of table shows that on an average the selected beneficiaries of Binodpur Gram Panchayat under Englishbazar CD Block of the Malda district attended 6 social audit meetings. Their awareness level about different aspects of the MGNREGS viz. the Act itself, issue of job card, application of job, payment of wage and social audit meeting stands at satisfactory position. In contrast their awareness level in case of selection of projects, allotment of work, development and approval of technical estimate is not satisfactory at all. Their overall awareness level stood at 50% as on the date of the survey. We have presented a figure showing comparison of the two GPs under Englishbazar CD Block in respect of the level of awareness and participation of the job card holders in figure 2.

Figure 2: Comparison of the two GPs (Fullbaria and Binodpur) under Englishbazar CD Block in Malda in respect of the Level of Awareness and Participation of the beneficiaries

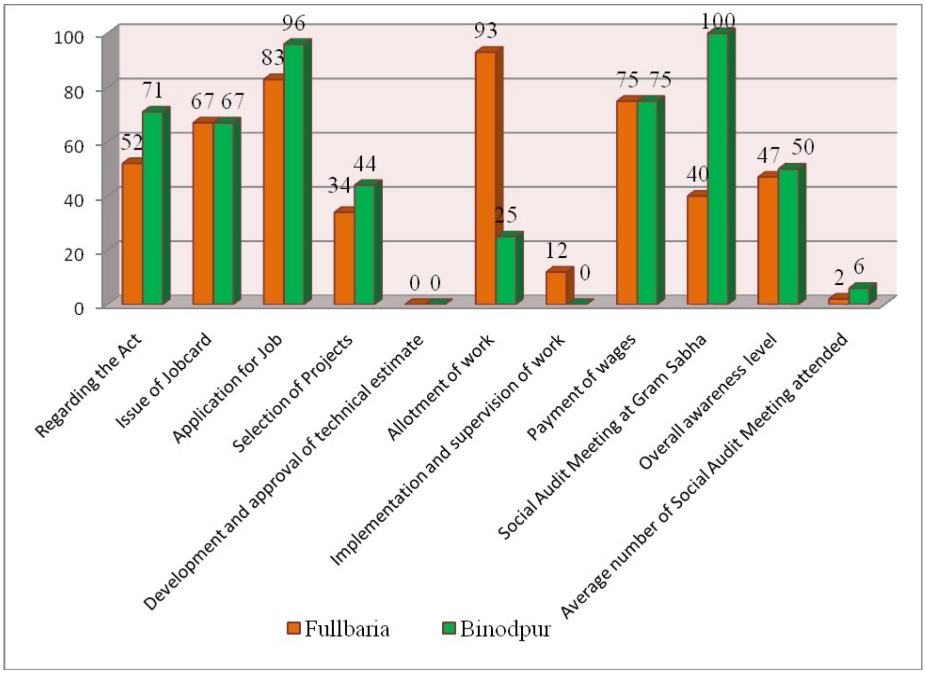

Source: Data calculated from primary survey.

Similarly, table 6 gives data regarding awareness level of the selected job card holders in respect of different aspects of the MGNREGS and the participation at the social audit meeting at *gram sabha* of the selected beneficiaries of the selected gram panchayats of the district Hooghly.

Table 6: Primary Data on the Awareness Level (AL) and Participation at Social Audit Meetings (PSAM) at *Gram Sabha* in Hooghly District:

Unit: Percentage

Name of the Block	Tarakeswar C.D. Block		Chanditala-II C.D. Block	
Gram Panchayat	**Keshabchak**	**Baligori-I**	**Barijhati**	**Janai**
Regarding the Act	38	60	64	71
Issue of Jobcard	64	64	67	67
Application for Job	51	83	29	3
Selection of Projects	30	38	35	56
Development and approval of technical estimate	4	4	0	0
Allotment of work	64	64	50	33
Implementation and supervision of work	0	0	50	0
Payment of wages	75	75	75	75
Social Audit Meeting at gram *sabha*	36	100	61	78
Overall awareness level	36	49	49	45
Average number of Social Audit Meeting attended*	1	8	5	6

Note:*- In number. CD means community development
Source: Data calculated from primary survey.

1st column of the same shows that average number of social audit meeting attended by the beneficiaries of Keshabchak Gram Panchyat under Tarakeswar CD block as on the date of survey has been only 1. However, their awareness level in some other important aspects of the scheme viz. issue of job card, application for job, allotment of work, payment of wages are satisfactory while in some other aspects e.g.the Act itself, selection of projects etc are not satisfactory. The overall awareness level as on that date stood at 36%.

Again, 2nd column of the table presents similar data of Baligori-I Gram Panchayat under Tarakeswar CD block. It reveals that the average participation of the beneficiaries is 8 social audit meetings, which is satisfactory. It also highlights that awareness level of the respondent job-card holders about most of the important aspects of the scheme is satisfactory except in selection of project and development and approval of technical estimate. The overall awareness

level has been 49% as on the date of the survey. Figure-3 reveals comparison of the two GPs under Tarakeswar CD Block.

Figure 3: Comparison of the two GPs (Keshabchak and Baligori-I) under Tarakeswar CD Block in Hooghly in respect of the Level of Awareness and Participation of the beneficiaries

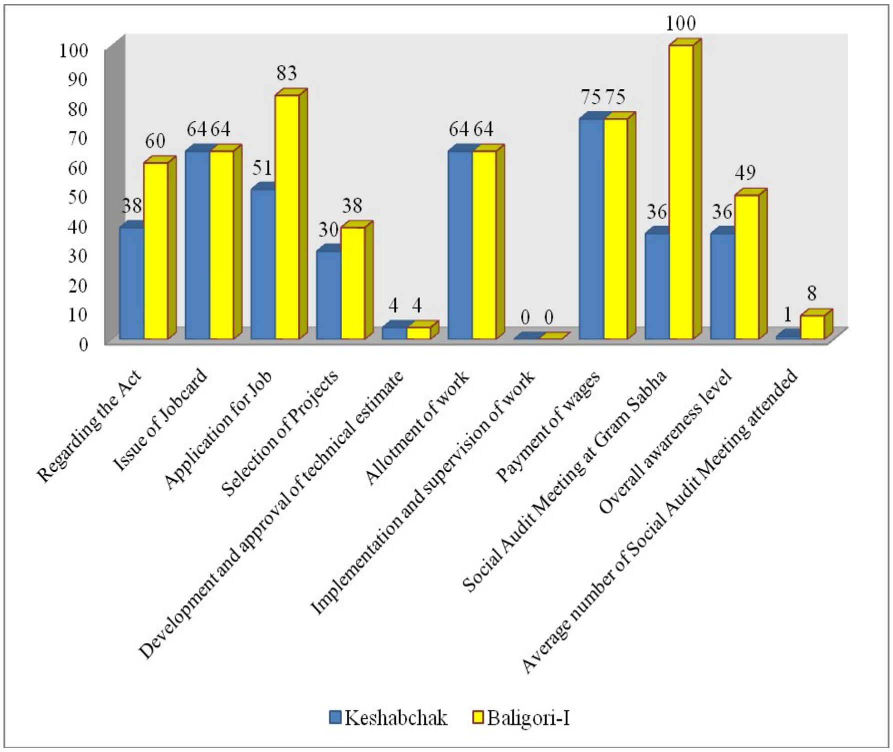

Source: Data calculated from primary survey.

Lastly the 3rd & 4th column give similar data in regard to the awareness level of the selected job-card holders and their participation at the social audit meetings at *gram sabha* as on the date of survey in Barijhati and Janai Gram Panchayats under Chanditala-II CD Block of the district. The data reveals that while in Barijhati the average number of social audit meeting attended by the beneficiaries is 5, it is 6 for Janai as on that date. Their awareness level in respect of the important aspects of the scheme is not very different except for application for job, selection of projects, and implementation and supervision of work, which can be discerned from Figure 4.

Figure 4: Comparison of the two GPs (Barijhati and Janai) under Chanditala-II CD Block in Hooghly in respect of the Level of Awareness and Participation of the beneficiaries

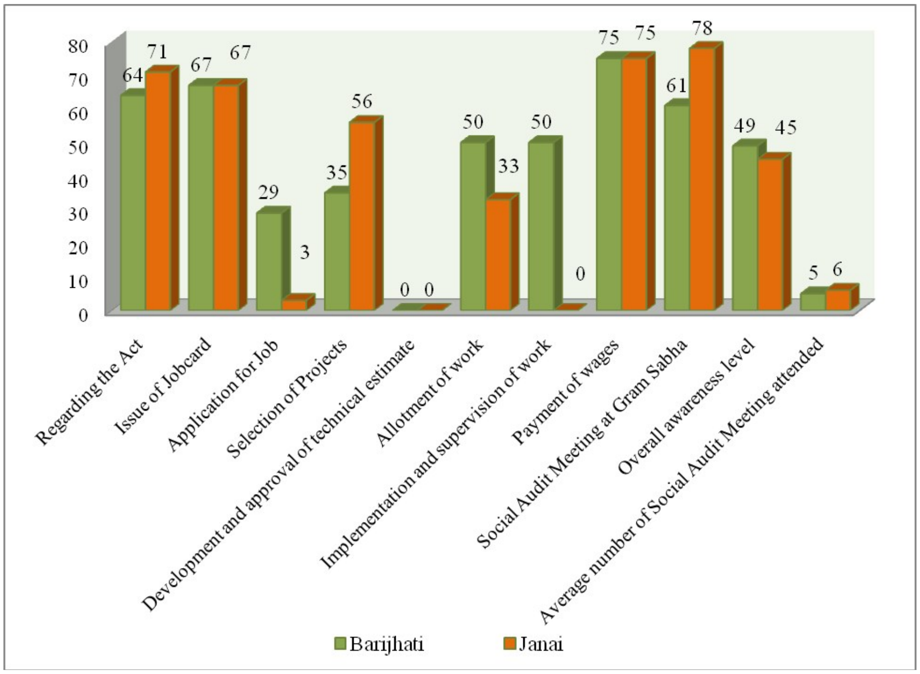

Source: Data calculated from primary survey.

B. Analysis of Data:

Participation of the job card holders at the social audit meeting at *gram sabha* held for the MGNREGS is the 1st precondition for achievement of higher awareness level on the ground that social audit meeting provides the platform, where all the potential beneficiaries and other stakeholders are expected to be given all the relevant information about the implementation of the scheme.

Thus at the first stage we have analyzed the data relating to participation at the social audit meetings at *gram sabha* of the selected beneficiaries in the district Malda and Hooghly by applying Fisher's 't' test[5] to ensure inter district comparison. The result obtained is presented in Table 7. The result shows that the mean participation of Hooghly is marginally better than Malda. However said difference has been found to be insignificant by applying Fishers' 't' test. A comparison of mean participation between two districts is also highlighted in figure 7.

Table 7: Fisher's't' test result for inter district comparison of Mean Participation of the respondent job card holders

H_o	H_1	N	DF	Calculated 't' value	Pr (T < t)	Pr (|T| > |t|)	Pr (T > t)
$\mu^{MP} = \mu^{HP}$	$\mu^{MP} \neq \mu^{HP}$	200	198	–1.2772	0.1015	0.2030	0.8985

Note : MP= participation at social audit meeting in Malda, HP = Participation at social audit meeting in Hooghly,
μ= Mean, H_o = Null hypothesis, H_1= Alternative hypothesis, μ= Mean, n= Number of observations, DF= Degrees of freedom, Pr(T < t) = Left tail test, Pr(|T| > |t|)= Both tail test , Pr(T > t)= Right tail test.
Source: Data calculated from primary survey.

Figure 5: Mean Participation at the Social Audit Meeting at *gram sabha* of the respondent beneficiaries in two selected districts

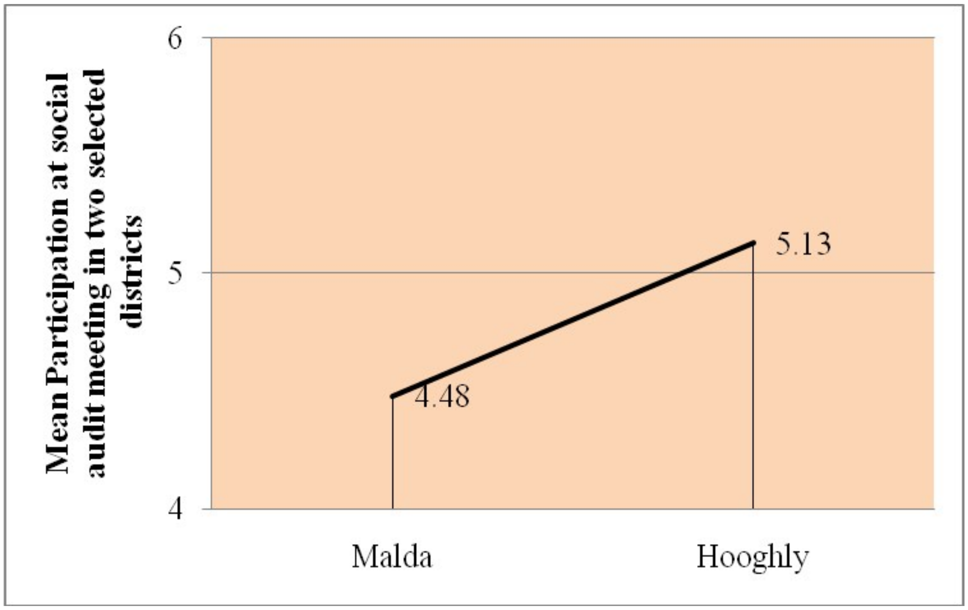

Source: Data calculated from primary survey.

Awareness level of the job card holders should be the basic outcome of their active participation at the social audit meeting at *gram sabha*. Thus at the second stage we have analyzed awareness level of the selected beneficiaries in two selected districts by applying Fisher's' test[6]. The result as given in table 8 shows that awareness level of the beneficiaries in Malda is marginally better than that in Hooghly. However, the said difference has been found to statistically insignificant. A comparison awareness level of the beneficiaries in two districts has been shown in figure 6.

Table 8: Fisher's't' test result for inter district comparison of Mean Awareness Level of the benefiaries

H_o	H_1	N	DF	Calculated 't' value	Pr (T < t)	Pr (|T| > |t|)	Pr (T > t)
$\mu^{MA} = \mu^{HA}$	$\mu^{MA} \neq \mu^{HA}$	200	198	0.7828	0.7827	0.4347	0.2173

Note: MA= Awareness level of respondent job card holders of Malda, HA= Awareness level of respondent job card holders of Hooghly; μ = Mean, n= number of observations.DF= Degrees of freedom.
Pr(T < t) = Left tail test, Pr(|T| > |t|)= Both tail test , Pr(T > t)= Right tail test.
Source: Data calculated from primary survey.

Figure 6: Mean Awareness Level of the beneficiaries in two selected districts

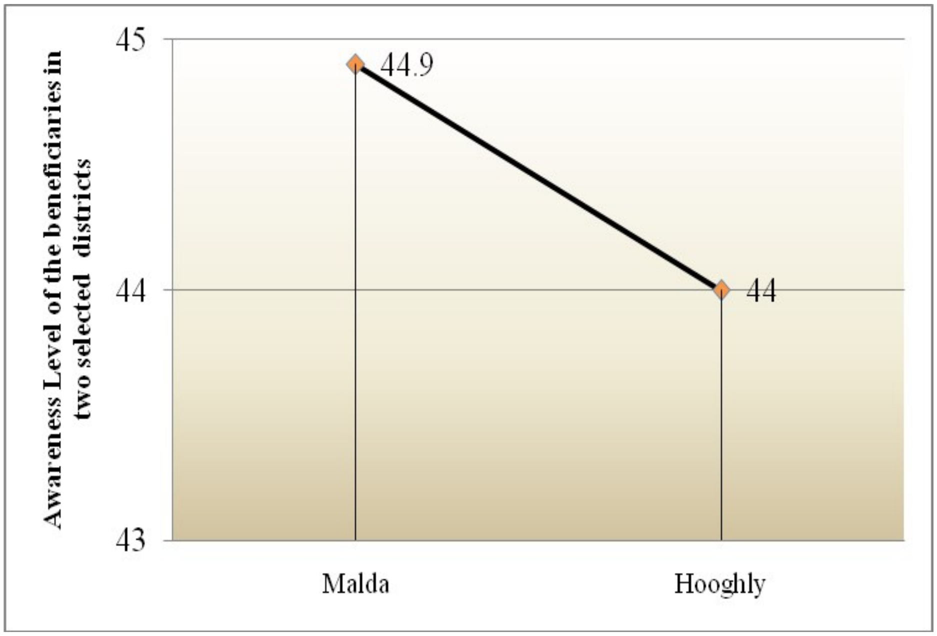

Source: Data calculated from primary survey.

Active participation at the social audit meetings at *gram sabha* is aimed at the enhancement of the awareness level of the job card holders. So, at the last stage of our analysis we have tried to find out the degree of association between participation at the social audit meeting at *gram sabha* of the respondent beneficiaries and their awareness level in two selected districts. The statistical result of two selected districts as highlighted in table 9.

Table 9: Inter-district analysis of association between Participation at Social Audit Meeting (PSAM) and Awareness level (AL)

District	Correlation Coefficient value	n	DF	Significant level (Students' 't' test)
Malda	0.36	100	98	1%
Hooghly	0.54	100	98	1%

Note: DF means degrees of freedom, n means number of observations.
Source: Data calculated from primary survey.

The statistical result, given in above table indicates that there has been statistically significant positive association between Participation at Social Audit Meeting and Awareness Level in both the districts. We applied Student's "t' test[7] for this purpose. That implies the participation of respondent job card holders at the social audit meeting at *gram sabha* has bearings upon their awareness level. Another important trend, which may be interpreted from the result, is that the degree of association in Hooghly is better than that in Malda. A comparison of the same between two districts may also be highlighted in figure 7:

Figure 7 : Comparison of Correlation Coefficient value between Participation at Social Audit Meeting (PSAM) and Awareness level (AL) of the selected districts in Malda and Hooghly

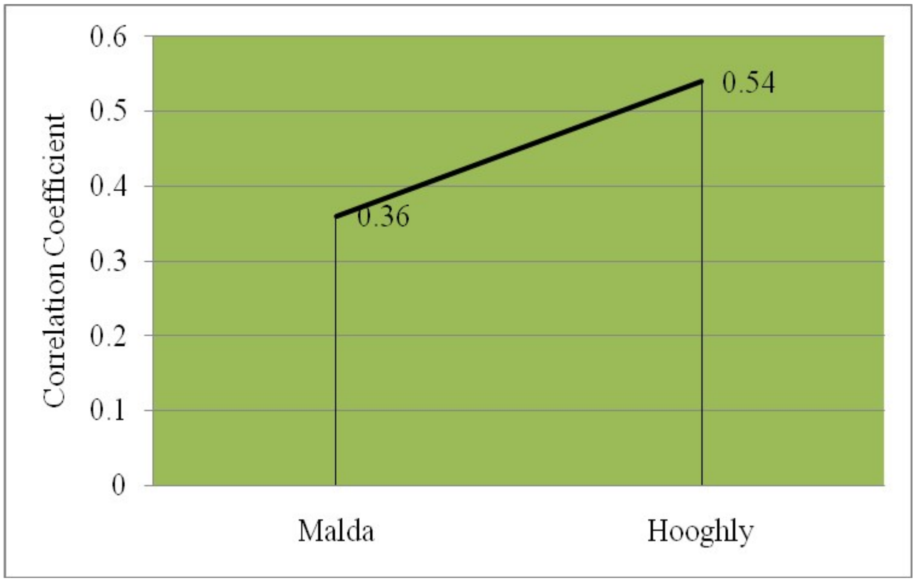

Source: Data calculated from primary survey.

From our above analysis it may be revealed that though there is no statistically significant difference between two districts in terms of mean participation at the social audit meeting at gram sabha and awareness level of beneficiaries, there is significant difference in two districts in terms of degree of association between two variables in two districts. That implies despite the fact that in both the districts active participation of the beneficiaries has positive bearings upon their awareness level, there is difference in degree of effectiveness. That contradiction further calls for searching whether there is any other influential factor, which may be found to be effective for channelizing the active participation of the beneficiaries towards their awareness level.

Table 10: Correlation coefficient between Awareness Level and its different influencing factors in West Bengal

Sl. No.	Factors		Correlation Coefficient (r_{xy})	n	DF	Significance level (Students' 't' test)
	X	y				
1	Awareness Level	Participation at Social Audit Meeting	0.44	200	198	1%
2	Awareness Level	Education Level	0.77	200	198	1%
3	Awareness Level	Caste Profile	0.75	200	198	1%
4	Awareness Level	Gender Profile	0.45	200	198	1%
5	Awareness Level	Occupation	0.76	200	198	1%
6	Awareness Level	Economic Status	0.21	200	198	1%

Source: Data calculated from primary survey.

Analysis of our data of field survey reveals that some socio-economic factors also exert significant influence on the awareness levels of the respondent job-card holders. Table 10 shows that apart from the participation at the social audit meeting at *gram sabha* the awareness level of the beneficiaries in West Bengal has significant positive correlation with some socio-economic factors viz. education level, caste profile, gender profile, occupation and economic status of the beneficiaries. Among these factors the influence of the education level (0.77), caste profile (0.75) and occupation (0.76) is very high. Further table 11 also shows that participation at the social audit meeting of beneficiaries is also significantly influenced by some socio-economic factors viz. education level, caste profile, occupation and economic status of the beneficiaries.

Table 11: Correlation coefficient between Participation at social audit meeting and its different socio-economic factors in West Bengal

Sl. No.	Factors		Correlation Coefficient (r_{pq})	n	DF	Significance level (Students' 't' test)
	P	q				
1	Participation at Social Audit Meeting	Education Level	0.28	200	198	1%
2	Participation at Social Audit Meeting	Caste Profile	0.31	200	198	1%
3	Participation at Social Audit Meeting	Gender Profile	0.07	200	198	No
4	Participation at Social Audit Meeting	Occupation	0.27	200	198	1%
5	Participation at Social Audit Meeting	Economic Status	0.3	200	198	1%

Note: DF indicates degrees of freedom.
Source: Data calculated from primary survey.

Socio-economic profile of the beneficiaries as shown in table 4 highlight that the literacy rate of the beneficiaries of Hooghly are better than that in Malda and level of education former is also better than the later. Better level of education has ensured more information about the scheme and hence resulted in more participation at the social audit meeting. Again Malda district is one of the backward districts in India where the MGNREGA was implemented at the first phase and table 4 also confirms existence of more BPL and AAY households among the beneficiaries in the district. Moreover the West Bengal Human Development Report shows that where as Malda stood at 14th position in terms of Human Development Index, Hooghly stood at 5th position (GOWB, 2004).As a result beneficiaries of the district seems to be more accustomed with the scheme and also their economic backwardness has also induced to be more aware about their entitlements provided in the scheme. The combined effect has resulted in better awareness level of the district as compared to Hooghly. However, both the differences have been found to be statistically insignificant. Further, higher literacy rate among the beneficiaries in the district Hooghly coupled with more existence of agriculture labourers among the beneficiaries in the district Malda, as shown in table 4, have resulted more active participation of the beneficiaries of the district Hooghly so as to channelize their participation towards awareness level. Existence of all those factors seems to be resulted in significant

better association between participation at social audit meeting and the awareness level in the district Hooghly as compared to Malda.

Thus from our analysis of secondary and primary data we may develop the following model to highlight the relationship among influential factors of the awareness level, awareness of the beneficiaries, success of the MGNREGS , sustainable development goals.

Participation at the Social Audit Meeting

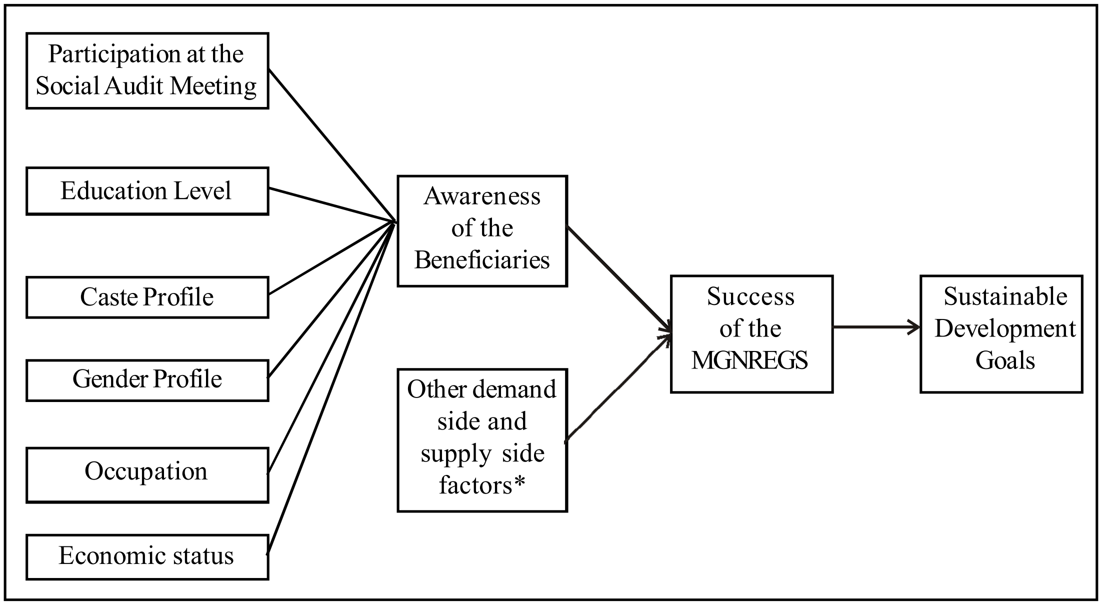

Note:*- Other demand side factors include poverty, agriculture labour, migration potentials, semi-feudal structure of rural economy and supply side factors includes availability of money in proper time, capacity of the GP, adequate planning, infrastructural backwardness of GP.

Source: Mukherjee & Ghosh(2009), Bandyopadhyay (2015) and Primary Survey.

It may be revealed from the aforesaid model that in rural West Bengal participation at the social audit meeting of beneficiaries has significant positive association with their awareness level. At the same time it is also fact that along with the participation at social audit awareness of beneficiaries is also significantly influenced by different socio-economic factors like education level, caste and gender profile, occupation, economic status. Again awareness level coupled with some other demand side as well supply factors have influential effect on the success of the MGNREGS. Since, the MGNREGS has lot of potentials to achieve sustainable development goals, successful implementation of scheme has positive influence upon the achievement of sustainable development goals.

V. Concluding Observations:

Successful implementation of the MGNREGA is one of the necessary pre-condition for achievement of sustainable development goals. Since India is one of the countries who have signed the declaration on 2030 agenda for sustainable development, successful implementation the flagship programmes like the MGNREGS in the states like West Bengal, where there exists acute problem of unemployment and poverty due to some historical reasons may yield very positive result towards achievement that goals. In spite that importance our experience shows very gloomy picture of previous welfare programmes, where it is not uncommon for dead people to get paid. But it is not the family of the deceased who benefit, its middle men or public servants who cheat the state subsidy system or deceive wages by fabricating names on the payroll. To prevent this tragedy the provision of mandatory social audit may be recognized as an important accountability tool in the development sector because it contributes to transparency and effective governance. Analysis of our results from primary survey also shows that active participation at the social audit by the beneficiaries has significant association with their awareness level. But although in our study we have mainly concentrated upon the effect of social audit meeting on the awareness level, it also reveals that some socio-economic factors also exert influential effect on the awareness level of the beneficiaries. Again, our secondary data confirms that awareness level of the beneficiaries coupled with other demand side factors viz. poverty, agriculture labour, migration potentials, semi-feudal structure of rural economy and supply side factors viz. availability of money in proper time, capacity of the GP, adequate planning, infrastructural backwardness of GP have influential effect on the success of the MGNREGS. Thus, we may arrive at the conclusion that in rural West Bengal since participation at the social audit meeting has significant positive association with the awareness level of the beneficiaries of the scheme, it has also positive influential effect on the achievement of sustainable development goals. However, there are some other socio-economic factors like education level, occupation, and economic status of the beneficiaries, which also play important role in this respect, which calls for further detail study.

References:

Aakella, K V, & Kidambi, S (2007) 'Social Audits in Andhra Pradesh: A Process in Evolution', *Economic and Political Weekly*, Vol.XLII(47), pp.18-19.

Afridi, F & Iversen, V (2013), 'Social Audits and MGNREGA Delivery: Lessons from Andhra Pradesh', *Discussion paper 13-09, Indian Statistical Institute*, Delhi Economics and Planning Unit,pp 1-48, Retrieved from https://www.isid.ac.in/~pu/dispapers/dp13-09.pdf on 16.09.2015 at 10.00 pm.

Aiyar, Y & Samji, S (2009), 'Transparency and Accountability in NREGA A Case Study of Andhra Pradesh', *Accounting Initiative*, AI Working Paper No.1, February, 2009, pp. 1-15.

Ambasta, *et. al* (2008), 'Two Years of NREGA : The Road Ahead', *Economic & Political Weekly*, Vol. XLIII(08),pp 41-50.

Bandyopadhyay, S (2015), 'MGNREGS, Social Audit And Rural Development : A Study of

Some Selected Gram Panchayats In West Bengal', Ph. D. Dissertation submitted to the Visva-Bharati, Santiniketan.

Centre for Wage Employment and Poverty Alleviation (CWEPA)(2014), "West Bengal Visit Report" 7-8th November, 2014 retrieved from : *164.100.129.6/netnrega/SocialAudit/guidelines/West%20bengal.aspx* on 18.08.2015 at 10.00 pm.

Fox, J. A (2015), 'Social Accountability :What Does the Evidence Really Say?', *World Development*, Vol. 72, pp 346-361.

Government of India, Census of India, 2011.

Government of West Bengal (2004), Department of Planning and Statistics, West Bengal Human Development Report, 2004, retrieved from www.wbplan.gov.in, on 16.04.2012 at 2.00 pm.

Government of West Bengal (2005), Department of Panchayat and Rural Development, West Bengal Rural House Hold Survey, 2005, retrieved from www.wbprd.nic.in, on 18.04.2012 at 2.00 pm..

KPMG (2017), *Sustainable Development Goals (SDGs): Leveraging Towards CSR to SDGs*, Retrieved from http//sassets.kpmg.comcontentdamkpmginpdf201712SDG_New_Final_Web.pdf on 06.11.2018 at 12.00 pm.

Mishra, S.K. & Puri, V.K. (2009), *Indian Economy*, 27th Edition, Himalayan publishing House, New Delhi.

Mukherjee, S & Ghosh, S (2009), 'What Determines the Success and Failure of '100 Days Work' at the Panchayat Level ? A Study of Birbhum District in West Bengal' *Occasional Paper No.16*, pp-1-34, Institute of Development Studies, Kolkata.

National Consortium for Civil Society Organizations on NREGA (2009), *The NREGA Operational Guideline, 2008,* retrieved from www.nregaconsortium.in on 22.04.2011 at 10.00 p.m.

National Institute of Rural Development (NIRD) (2008), 'Evaluation of Implementation of NREGS in Orissa, 2008', Hyderabad.

Niti Aayog, Government of India (2018), *Mapping of Sustainable Development Goals*, New Delhi, Retrieved from http://niti.gov.in/content/SDGs.php on 06.11.2018 at 6.00pm.

Official website of MGNREGA www.nrega,nic.in , last visited on 15.10.2015 at 1.00 pm.

Pankaj ,A K.(2012), 'Demand and Delivery Gap : A Case for Strengthening Grass-roots Institutions in Bihar and Jharkhand', in Ashoke K. Pankaj (Ed.)(pp.101-128), *Right to Work and Rural India*, SAGE Publications India Ltd., New Delhi.

Peicheva, *et.al* (2017), 'Study of the Social Audit and Standards for Social and Environmental Responsibility- A Case Study of Bulgaria', *Economic Alternatives*, 2017, Issue 3, pp 449-473.

Rajasekhar, *et. al.* (2013), 'How Effective are Social Audit under MGNREGS? Lessons from Karnataka', *Working paper 294,* The Institute for Social and Economic Change, Bangalore, pp.1-18.

Reddy, S. C. (2013), 'Innovation, Transparency and Governance : A Study of NREGS In Andhra Pradesh', *Journal of Rural Development*,Vol-32(2),pp.107-120.

Shankar, S (2010), 'Can Social Audits Count?' ASARC Working Paper , 2010/09, retrieved from https://crawford.anu.edu.auacdeasarcpdfpapers2010WP2010_09.pdf on 11.11.2018 at 11.40 pm.

Shah,M & Ambasta,P (2008), 'NREGA: Andhra Pradesh shows the way', *The Hindu*,September, 08, retrieved from https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-opinion/NREGA-Andhra-Pradesh-shows-the-way/article15298805.ece on 12.11.2011 at 10.30 am.

Singh, R & Vutukuru, V (2009), 'Enhancing Accountability in Public Service Delivery through Social Audits: A case study of Andhra Pradesh, India', retrieved from http://www.socialaudit.ap.gov.in/SocialAudit/AcedPub.jsp# on 27.08.2011 at 2.30 pm.

United Nations (2015), *Transforming World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, retrieved from https://sustainabledevelopment.un.orgcontentdocuments 21252030%20Agenda%20for%20 Sustainable%20Development%20web.pdf on 04.11.2018 at 11.37 am.

Vij, N (2011), 'Building Capacities for Empowerment :The Missing Link between Social Protection and Social Justice : Case of Social Audits in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in India', Paper presented at International Conference on *Social Protection for Social Justice*, UK, 13-15th April, 2011.

Footnotes

1 *The National Rural Employment Guarantee Act, 2005 was renamed as the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act by the National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill in the Parliament on 26th November, 2009.*

2 Blocks were selected on the basis of BPL percentage found in West Bengal Rural Household Survey, 2005 (GOWB, 2005) and MGNREGS fund utilization during 2009-10 to 2010-11 retrieved from the Official Website of The MGNREGA and same methodology was applied in other blocks' selection and afterwards selection of Gram Panchyats from the selected blocks.

3 In this article the term 'beneficiaries' and 'job card holders' have been used interchangeably and in same meaning.

4 Our period of study is 2009-10 to 2014-15.

5 It is applied to test the significance of difference of mean of two groups of samples.

6 op.sit.

7 It is applied to test the significance of the correlation coefficient.

Somnath Bandyopadhyay
Assistant Professor in Commerce
Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya
Majdia, Nadia-741507, West Bengal.

Is PremKumar's Kai Varisai the Most Progressive Past ? : A Comparison of Gender Equality in Films of Two Centuries

Jayashree Premkumar Shet

Abstract

Feminist film theories' suggestions are discrete and imbricated so highly that it is really a Herculean task to get them implemented into the films. In spite of this fact many directors have depicted strong women in visual media synecdochically to exhibit their social concerns. Flannery (2009) says that history is creating a tradition of itself by representing and interpreting only what it holds and thereby hides all that is unsaid. If the 21st C film-makers don't purchase what progress has been already done, they will be back to square one. This study compares G. Premkumar's 'KaiVarisai', a 20th C film with the contemporary films of five different Indian languages and tries to seek whether the contemporary 21st C films have moved further in reforming the society through better representation of women in films or G. Premkumar's 'Kai Varisai' is still the most progressive past. Through the application of Feminist Film Theories, The Mako Mori test, The Sexy Lamp test, Critical Mass and Critical Actor Theory and Bechdel–Wallace test this paper tries to compare, explore, the cinematic feminism through on-screen characters' gender representations and the storyline's interpretations in these films. Based on quantitative method and also by qualitative analysis the study discovered the bitter truth that Premkumar's Kai Varisai is a milestone in offering Gender Equality in films and more progressive than the 21st C films, which still hatch out stereo-typed women in male-dominated films or unrealistic characters in so-called feminist films.

Keywords: feminism, 21st C films, Premkumar's *Kai Varisai*, progressive

Introduction

Sprung out of the waves of feminism the feminist film theories have 'Great Expectations' from Cinemas. The Make Mori Test, The Sexy Lamp Test, Bechdel–Wallace Test, Critical Actor Theory as well as Critical Mass Theory and all the other film theories clamour for more female representation on and off screen, less stereo typed portrayals and women centered films. It's obligatory for any film directors to be at least a little knowledgeable about feminist theories and compassionate towards women and consider and work for women's empowerment. Moreover, the fact is that the subordination of women and the male dominance has not always been there, it's neither natural nor eternal and not omni-present. It wasn't there in Nair Society in Kerala before British Colonization or in Nile Valley Civilization and

Shet, Jayashree Premkumar : Is PremKumar's Kai Varisai the Most Progressive Past ? : A Comparison of Gender Equality in Films of Two Centuries

Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 2, Dec 2021, Page : 81-90, ISSN 2249-4332

the Bari of Columbia and in pre-Islamic culture. As a social -mirror cinemas should showcase all the facets of the present-day society but, do they actually exhibit all the prevalent features? Even in the regions where women aren't given equal rights the cinemas with its almighty power should be role-models in the emancipation of women. The study wants to check whether the films portray our women physically or emotionally strong and capable as many of them really are, or do they want to still satisfy male-egoistic pleasure by portraying women as sub- ordinate to men and puppets in the hands of strong men and thus serve the old wine with which media can mint money with.

Indian Cinema is one of the gargantuan industries in the world producing almost 1,000 films per annum and its reach is as high and wide like Hollywood films. As, Amitab Bachhan, India's well-known actor once said, "Indian Cinema has virtually become a parallel culture.". An odyssey of Indian Cinema will lay bare the film makers who know culture is not static and who made films to mirror the social issues.

This comparative study intends to differentiate the cinematic feminism between 20th C Premkumar's 'Kai Varisai' with five 21st C Indian blockbuster with the assumption that modern high budget productions portray feminism conventionally through unrealistic characters while the 20th C productions portrayed feminism progressively through reflective and self-determined, female characters.

Research Design and Methodology

As argued by Erigha (2015:79) silver screen representation of multifaceted: numerical, Centrality and quality of representation. So, numerical approaches become obligatory. The study intends to check whether there is under representation of women in the selected films of 20th and 21st C.

Besides quantitative method the researcher chose descriptive method too to complete this paper. In this study the researcher tried to find out the how the 20th C film Kaivarisai fares in comparison to 21st C films. For this, books, websites were studied. A few interviews were held with the Director of the Film, Mr. G. Premkumar, whose 20th C film is taken for the study.

1. Does Premkumar's Kaivarisai fare well than the 21stC Films in Critical Mass and Critical Auther Theories? - A quantitative analysis and description method will be given

2. Quantitative Analysis will be done to check which films pass the feminist film theories: The Make Mori, Bechdel, Sexy Lamp and other tests and theories, a self- coded sheet will be prepared and the films will be analyzed. And the points will be shown in tables and a chart.

3. To check the number of appearances by the lead and the second lead characters of both male and female characters and the number of scenes without men/women quantitative method will be adhered. Tables and charts will check the quantity-wise women-representation in the films.

4. Do the films show qualitative and centralized representation of women? A descriptive and comparative method will be discussed.

Research Sample

The following six films are taken for the study.

Table.1

Films For the Study

Title of the Film	Release	Language
Kai Varisai	1980	Tamil
Ponmagal Vanthaal	2020	Tamil
Yevada Subramanyam	2015	Telugu
Thanaji	2020	Marathi, Hindi
Big Brother	2020	Malayalam
Kotti Gobba 2	2016	Kannada

Results and Discussion

Along with the six roles as proposed by Lauzen in her research: director, writer, producer, executive producer, editor, and cinematographer (Lauzen, 2018) The researcher took into account lyricist, singer and music composer too as in Indian cinema songs have greater impact on the audience.

Table 2.

No. of People Behind the Scene

Name of the Film	Number of Prominent people off the Screen (Male)	Number of Prominent people off the Screen(Female)
Kai Varisai	9	7
Ponmagal Vandaal	8	5
Tanaji	16	3
Yevade Subramanyam	15	5
Big Brother	16	2
Kottigobba	14	3

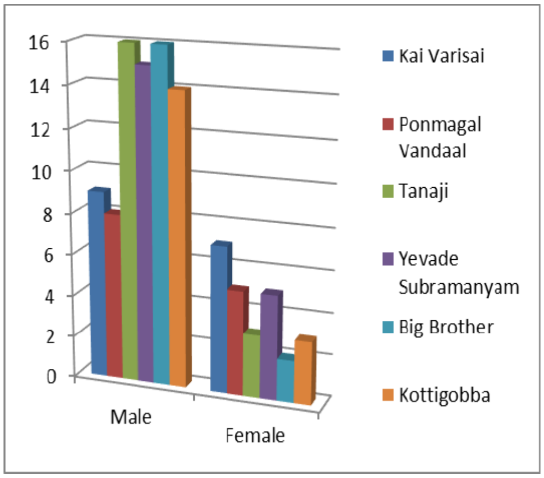

Fig.1. People Behind the Screen

The study finds Kaivarisai tops the test in Critical Mass Theory as well as Critical Author Theory as its Director G.Premkumar has been in the filmdom for more than for more than 8 years at the time and it was his 5th film. Despite the fact that Om Raut received a State Award for Lokmanya: Ek Yug Purush, Thanaji is just his second film. Nag Ashwin and J.J. Fredrick made their debuts in the films chosen here. The Critical Actor Theory fails with veteran directors Siddique and K.S. Ravi Kumar who have filmed more than 25 and 24 films respectively.

Table 3

Self Coded Sheet – The Make Mori & Bachedel Tests

Code No	Code	Points	Kai Varisai	Thanaji	YeVade Subbra manyam	Kotti gobba2	Big Brother	Pon Magal Vandal
1	Is there at least one female character?	1	1	1	1	1	1	1
2	Does the female character get her own narrative?		1	0	1	0	1	1
3	Is female's story an independent one or supporting a man's story?		1	0	0	0	0	1
4	Does the movie have at least two women in it?		1	1	1	1	1	1
5	Do Women talk to each other?		1	0	0	1	1	1
6	Do female characters talk about something other than a man?		1	0	0	0	0	1
7	Are the two women named characters?		1	1	1	1	1	1
8	Is there at least a total of 60 seconds of conversation?		1	0	0	1	1	1

All the chosen films survive the test the Mako Mori test which insists on having at least a woman's role in the film. Bechdel Test, Brain-Child of Alison Bechdel (1985) wants two female characters who converse anything that is not related to male. The 7and 8 are variants of the same test. Other than Kaivarisai and Ponmagal Vanthal, all the four films fail this test. This ratio is far below than the results on the database: 55.4% pass out of 4193 movies tested, (Bechdel, 2013).

Table 4
Self Coded Sheet

Code No	Code	Points	Kai Varisai	Thanaji	YeVade Subbra manyam	Kotti gobba2	Big Brother	Pon Magal Vandal
9	How many female characters are relevant to the plot of the film? [The Sexy Lamp Test]	Yes, One point for each	3	0	2	1	1	2
10	Is there a female protagonist? Is she successful?		1	0	0	0	0	1
11	Is the female protagonist successful on her own?		1	0	0	0	0	0
12	Is the film a female-oriented one?		1	0	0	0	0	1

The Sexy Lamp test checks the relevance of the female character to the plot. Other than Thanaji the rest emerge successfully in this test.

Table 5
Self Coded Sheet -Empowerment, Economic Independence and Intelligence

Code No	Code	Points	Kai Varisai	Thanaji	YeVade Subbra manyam	Kotti gobba2	Big Brother	Pon Magal Vandal
13	Are they originally portrayed in the same stereotypic ways?	One point for each main Role	3	0	1	1	0	1
14	Does the heroine become the heroic in the film?		3	0	1	1	0	1
15	Do the women express their ambition?		1	0	0	1	1	1
16	Any sign of women's economic independence?		3	0	2	1	0	1
17	Do the female characters as skilled / professional ones?		3	0	2	1	0	1
18	Do the female express their thinking or feeling?		3	1	1	1	1	1
19	Are women portrayed as intelligent ones		3	0	1	1	0	1

Feminist film theories demand potent female protagonists, who possess intelligence, which is in the words of R. Pinter "ability to adapt oneself adequately to relatively new situations in life." (Sternberg J. R, 1987) Also M. Minsky (1985) opines intelligence is "the ability to solve hard problems." So, the study analyzed the plot and tried to find whether women find solutions for their problems by themselves or still rely on the hero or other men to get saved. Intelligence, economic independence and empowerment are the milestones for abolishing gender Inequality. KaiVarisai tops with 19 points.

Table 6

Self-Coded Sheet- Freedom, Effort

Code No	Code	Points	Kai Varisai	Thanaji	YeVade Subbra manyam	Kotti gobba2	Big Brother	Pon Magal Vandal
20	Do the female characters have freedom?	Yes, one point for each decision	3	0	1	1	1	1
21	Do the female characters change their lives on their own?		3	0	1	1	0	0
22	Do the female characters talk /fight against inequality?		3	0	1	1	0	1
23	Is the female protagonist's change not influenced by men?		2	0	0	0	0	0
24	Is there any action taken by the female characters not to be a victim?		3	0	1	1	0	1

Other than Thanaji and Big Brother, the rest portray what's prevalent in the society.

Table 7

Self-Coded Sheet–Deciding Authority

Code No	Code	Points	Kai Varisai	Thanaji	YeVade Subbra manyam	Kotti gobba2	Big Brother	Pon Magal Vandal
25	Do the female characters take their own decisions?	Yes, 1 point for each big decision	3	1	2	1	1	1
26	Are her decision put some body in trouble and make her regard as foolish or novice?		1	1	1	1	1	1

In all the films the women characters are offered freedom to take decisions.

Table 8.

Self-Coded Sheet to verify the films passing various film tests

Films	Kai Varisai	Thanaji	YeVade Subbra	Kotti gobba2	Big Brother manyam	Pon Magal Vandal
Total Points	51	5	21	20	11	23

One can see the vast difference in points between Kaivarisai and the 20th C films.

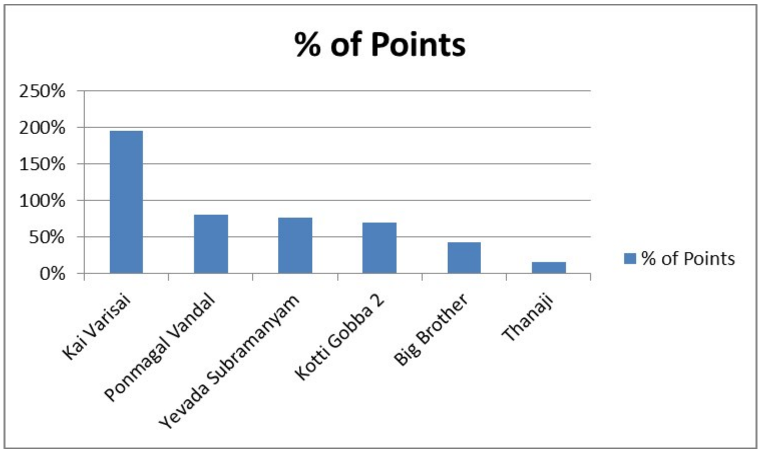

Fig.2 Percentage of Points Obtained by the Selected Films

1980s was the heyday of feminist film theories and it's obvious in the above graph. KaiVarisai scores 51 points in the self -coded Sheet, the other films are nowhere to it.

Table 9

Appearances of Lead Characters

Films	Male Lead Characters		Female Lead Characters	
	Hero	2nd Lead Role	Heroine	2nd Lead Role
Kai Varisai	30%	20%	36%	13%
Ponmagal Vandhal	39%	31%	38%	15%
Yevada Subramanyam	89%	14%	48%	13%
Thanaji	45%	31%	13%	7%
Big Brother	60%	35%	18%	19%
Kotti Gobba 2	71%	16%	35%	11%

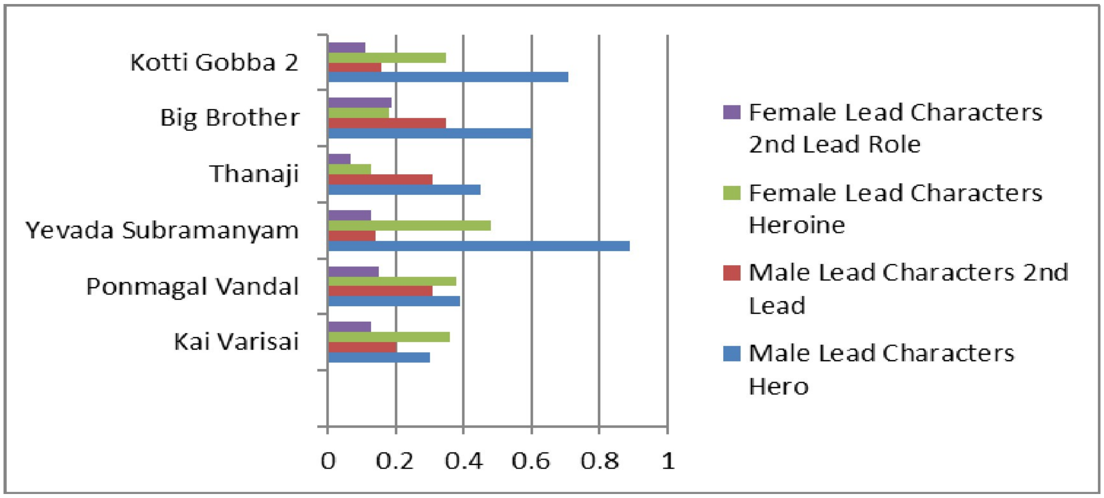

Fig. 3 Appearances of Lead Characters

Kaivarisai tops the table with 36% of scenes allotted to the heroine while the hero appears only in 30% of scenes.

Table 10
Percentage of Scenes with/without women

Films	% of Scenes without Women	% of Scenes only women	% of scenes women talk something other than men
Kai Varisai	32%	8%	4%
Ponmagal Vandal	27%	18%	3%
Yevada Subramanyam	25%	0%	0%
Thanaji	71%	3%	3%
Big Brother	51%	2%	0%
Kotti Gobba 2	55%	2%	2%

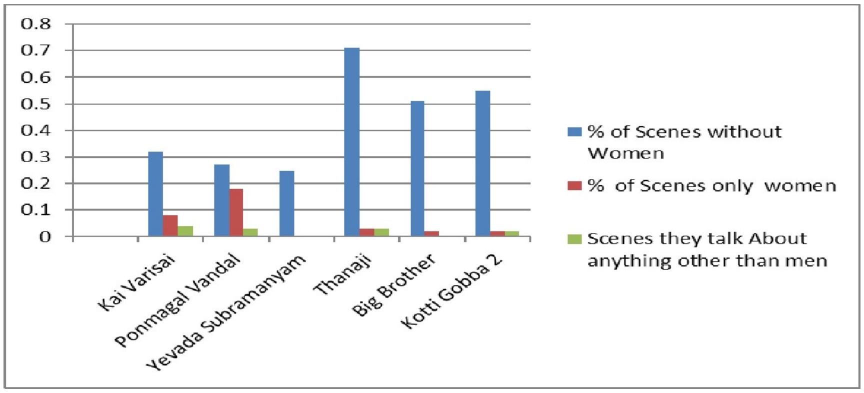

Fig.4 Scenes without women and with Only Women

The study went through scene by scene of the films and found that Fifty-Fifty Motto is followed only in KaiVarisai and Ponmagal Vandhal.

The query whether the 21st C films are the spokespersons of marginalized voices and do they follow their predecessors to be the torch bearers of women's equality has received a negative result. Shelley Cobb and Yvonne Tasker (2016) are of the view: filmdom holds a pivotal cultural role and film criticism could detail the scandal of women's marginalization in multiple ways. In India the female literacy rate is grown by 59.2% to 65.7%, whereas there's only 4% literacy growth in males (2011 to 2018) But the films portray still the stereo-typed ones. *Yevade Subramaniyam* is the journey both physically,spiritually and metaphorically in the panoramic scenes of the Gorgeous Mount Himalayas. The heroine, Malavika who has been 'omni-present' is just playing the second fiddle to the hero's magnificent path of self-realization Also, in Kottigobba 2 the heroine has to play just a romantic partner for Sudip, who fills the silver screen with his dual roles. Big Brother and Thanaji, the typical blockbusters with superheroes are devoid of gender equality in quantity, quality and centrality. Though dealing with a big social issue-child rape and the secondin points list, *Pon Magal* Vandhal has miles to go as it is a mockery to feminism with the heroine doing a lot of cry and is dependent on male characters to be victorious towards the end. Kai Varisai, though the lead role was played by Jai Shankar, the actor who has acted as a hero in more than 275 films, the heroine, Seema is not sidelined. The Second heroine again a very famous actress from Bollywood was given due importance. The importance given to the sister's career, his consent to her love affair makes the film in every way a beautiful road to women's empowerment.

Based on background quantitative data as well as a qualitative content analysis, this paper found that portrayals of women are much more positive quantitatively, qualitatively and centrality is assured in movies directed by Mr. G. PremKumar in 1980's. These positive portrayals are affected by the presence of the critical actor Mr. G. Premkumar as the Director behind the scenes who believes Cinema, the Visual Media can bring about a lot of changes in the society, whereas the 21st C films haven't gone any extra mile, rather they lag behind Premkumar's portrayal of heroines in Kai Varisai. A humble request to film fraternity is be the voice of Marginalized who suffer for generations under patriarchal hegemony.

Conclusion

To conclude, even though there are innumerable feminist movements. (Media Awareness Network, 2008), across the decades indulge in the crusade, there is little improvement in the portrayal of female characters in the films and to be precise, the films do not even try to venture as much as the last century directors did. Shelley Cobb and Yvonne Tasker (2016) opine the wane in feminist film criticism is owing to Post structuralism and media studies. The women should have the firm mind, decisiveness, wisdom to solve her problems by herself. Hope understanding their responsibility as well as potentiality, the film-industry would showcase strong women as Berger (2008) rightly points out that eighty percent of information is received through our eyes in his "*Seeing is Believing.*"

Recommendations

There could be researches on the persistent puzzle of the discrimination and male domination. Further studies may probe on factors that are contributing to the mis-representation and tenacious under-representation of women in films.

Works Cited

Andrew M. Lindner and Ziggy Schulting. "Sociological Research for a Dynamic World". *Socius,* Vol 3, 1–6, 2007, DOI: 10.1177/2378023117727636

"Bechdel Test Movie List Stats." Bechdel Test Movie List, http//: www. bechdeltest.com/ statistics/ [Accessed 18 April 2020].

DeFleur, M., & Dennis, E. *Powerful effects: Media influences on society and culture. Understanding Mass Communication.*6, 1998, pp.480-489. New York: Houghton Mifflin Co.

Erigha, Maryann.. "Race, Gender, Hollywood: Representation in Cultural Production and Digital Media's Potential for Change." *Sociology Compass,* 9, 1, 2015, pp. 78–89.

Fowdur, Lona, Vrinda Kadiyali, and Jeffrey Prince.*International Journal of Social Sciences* Vol. VIII, No. 2 / 2019 Copyright © 2019, FEI JIUN KIK, kikfj@tarc.edu.my 90

Shet, J..P. "Representations of Women in Premkumar's Film Sayoojyam". *International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, Vol. 7, No. 5, 2020, JETIR200540 doi.one/ 10.1729/Journal.23686

Johnson, P. 1978. *The civilization of ancient Egypt*. Book Club Associates, London, UK.

Lauzen.M.M "The Celluloid Ceiling: Behind-the-Scenes…" The 2017 Celluloid Ceiling Report 2016.

Minsky. M "The Society of Mind" Simon and Schuster New York, 1985.

Premkumar. G. Interview Conducted by Jayashree.P, 20 May 2020

Robinson, Marilynne "The Believer: Flannery O'Connor's 'Prayer Journal'" Sunday Book Review. The New York Times 2013

Shelley Cobb and Yvonne Tasker, "Feminist Film Criticism in the 21st Century", *Film Criticism*, Volume 40, Issue 1, January 2016, DOI:http://dx.doi.org/10.3998/ fc.13761232.0040.107

Sternberg, R.J. "Intelligence" The Oxford companion to the mind oxford. Oxford University Press, 1987. pp. 375-379.

"Yevade Subramanyam" (2015) - www.imdb.com/title/tt4515070/

Jayashree Premkumar Shet
Assistant Professor, Department of English Language and Translation,
College of Science and Arts, An Nabhanya
Qassim University, Saudi Arabia

The Space of the Other - The Body of the Dalit Woman as a Third Space in the Brahmanical Paradigm of *Ghare Baire Aj* - A Modern Political Retelling of Tagore's Classic

Medhasree Talapatra

Abstract

Judith Butler in her book *Gender Trouble* says that the very concept of sex, is actually perceived as an instrument of cultural signification, however, it is a discursive formation that acts as a naturalised foundation for the nature-culture distinction as well as the strategies of domination that distinction supports. From this argument, she quickly transcends to conclude that this binary of relationship gives rise to a hierarchical relationship where culture supersedes the idea of nature thereby freely rendering it into an 'Other' to be appropriated to its own limitless uses. The sex/gender and nature/culture dualism are often intrinsically naturalised through one another reifying relations of subordination. The position of the woman especially the married woman is a qualifier that distinguishes and dichotomises a differentiated patrilineal identity. Her existence emerges from the very idea that her existence lies within her body - a body serving the construct of family through bodily labour- both sexually and manually. Her identity is fluid moving quickly from one patronym towards another. *Ghare Baire* or *The Home and The World* by Rabindranath Tagore was published in 1916 and ever since has seen multiple onscreen adaptations. The latest one by Aparna Sen, titled *Ghare Baire Aj* can be easily seen as a custodian mouthpiece of the political conundrum that has enmeshed India in recent times. Her retelling posits Bimala, rechristened as Brinda in a precarious position not only torn between her husband and her paramour, but she is also a Dalit woman whose very identity has been dubiously thieved replacing it with a clever Brahmanisation. This paper endeavours to comprehend the exogamic heteronormativity albeit a forced one by placing the body of the Dalit woman who has been brought into the centre- an act which has only strengthened her marginalised identity. This is not only seen in her actions which seem to question where in this world lies her home but she inadvertently becomes a part of a pre-discursive libidinal economy which further problematizes her very notion of identity vis-a-vis through language which for her assumes a curious ontological position. This paper looks into the social and societal position of the Dalit woman in accordance with her bodily existence through a curious struggle for survival in the patriarchal paradigm coupled with the already existent class prejudices.

Keywords: Dalit, Existence, Exogamy, Identity, Margin, Centre, The Other, Body, Gender.

Talapatra, Medhasree : The Space of the Other - The Body of the Dalit Woman as a Third Space in the Brahmanical Paradigm of *Ghare Baire Aj* - A Modern Political Retelling of Tagore's Classic

Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 2, Dec 2021, Page : 91-97, ISSN 2249-4332

The commencement of the film places the solitary Brinda amidst a cacophonous household where she sits reminiscing of her metamorphosis into Brinda from the long-forgotten Bimala Manjhi- who used to live in a little bustee beside a coal mine in Jharia. Her parents' demise brings her to the posh Chowdhury household at Maharani Bag New Delhi to her grandmother Savitri Manjhi. Quickly the audience is told that she is now the wife of Nikhilesh Chowdhury, a graduate from Lady Shri Ram College and a proof-reader for Oxford University Press, almost all in the same breath. The black and white of the past make way for the coloured past and we quickly acquaint ourselves with the lady of the house. She is Mrs. Chowdhury, not Manjhi. Her identity is new and never questioned. She says "ami mainly ghar theke e kaj kori, karon amar ar Nikhil er ei shongshar amar kache khub khub important" ("I mainly work from home and I prefer that. This home that Nikhil and I have made together is very, very important to me")

In Tagore's novel, Bimala's primary observation roots her position as the ideal notion of Indian femininity rooted in the tripartite role of a daughter, mother, and wife. She is the very centre of Tagore's The Home and the World vacillating between the two forces of love and duty walking the thin line of assertive independence amidst the flaming political scenario of the then Bengal. She was characterised as a woman replete with womanliness but devoid of that celestial beauty that might enthral men. She was brought into the household of the zamindar based on her auspicious astrological chart which is blissfully captured in her harmonious conjugality with Nikhilesh who endeavours to make her leave the known boundaries of her home and become a human of the world. He thinks like all men, all kind men his benevolence is geared towards Bimala's good. The readers both then and now do not feel any differently. The question is never raised if Nikhilesh had actually asked Bimala what she wanted, because we immediately place Nikhilesh on this pedestal because he is unlike most entitled Indian men whom we see every day everywhere. He wants his wife to be free, so why should it matter if he had actually ever asked her what she wanted ?

In the twentieth century, her prolific independence is handed to her by her husband. She even has an English tutor, Miss Gilby. The camaraderie that she shares with her husband is easily established in her delightful reading of the letters he writes to her from Calcutta. Theirs is a relation between equals. Tagore establishes that very swiftly. Their paradise is jeopardised with the arrival of Sandip, a revolutionary basking in the glory of the Swadeshi movement. Sandip's boundless charm seemed to transport her from idyllic innocence to Blakean experience. Dishevelled by his magnanimous speeches soon she transforms radically into an inspired champion of Swadeshi outside in the wide world. She no longer associates herself with her conservative aristocratic household but seems impervious to every banality that had hitherto seemed important. Nikhilesh steps aside for her to experience it wholeheartedly. And where her actions seem to misplace her virtue, she is not shunned or castigated but allowed to have an experience that completes her persona. Nikhilesh, in the novel, remarked that if they meet and recognize each other in the real world then only will their love be true. Bimala's emergence

at the end, burnt in the fire of passion and cleansed in the flame of truth is nonetheless marked by a futility of her new-found devotion. Bimala is a woman of home who had ventured into the world and returns once again, her identity renewed but essentially the same. Primarily because her identity had never quite seen a displacement !

The displacement brought into Sen's Bimala's identity emerges from a struggle for survival and existence within the known paradigm of the sophisticated Chaudhurys who adopt her and rechristen her as Brinda- the first step towards acceptance and loss of self. Nandini Chaudhury inadvertently feels that she would have a better chance of being accepted into her boarding school if she enters with a Brahmanised upper middle-class name. While the name Bimala means "pure", the name Brinda means 'Radha'. While both names are a part of mainstream Hindu households, this decision to revert from one name to another can be seen to wrest the familiarity of the erstwhile identity of this girl that she had spent in Bihari bustee. This is perhaps the most significant displacement of identity that Bimala undergoes. It is interesting to note that while the little girl is brought into the Chaudhury household, Nikhilesh is hardly interested in understanding this child and why should he? She is but the granddaughter of his Dalit nanny. It is only when Savitri is on her deathbed and she reiterates this conundrum of her granddaughter's displaced identity- no upper-caste Hindu man would accept her because she is a Dalit woman and no Dalit man would be willing to marry her because she is much more educated than them, then what is to become of her? The camera shifts to Nikhilesh who looks visibly distraught but seems to be extremely alert of the sensuality that this young girl seems to exude. He decides to marry her. She had already been adopted now why should she understand the notion of another home? A decision she complies with happily because what definition of happiness, has she comprehended other than pity? The master takes pity on the Dalit girl and marries her, becoming her master, her 'swami' and she immediately shifts from being a Dalit to being an upper-caste Hindu. Because in Hinduism, according to *Manusmriti* caste is essentially and exclusively a man's right, a woman belongs to her father's caste as a child but once she is married, she adopts that of her husband. Her metamorphosis is now complete. She continues serving him by being a wife, a companion, and supporting him in his successes and failures. Sandeep's arrival becomes an opportunity for Brinda to relocate to her roots- when he addresses her in her dialect, that she had stopped speaking, knowing it to be a deviation from the norm, speaking in that familiar tongue brings back to her the identity she had (un) willingly surrendered in order to continue surviving.

Sandeep's seduction of Brinda is not abrupt- her attraction towards this man whom her own husband describes as devilishly handsome is apparent from the very first moment they meet. Nikhilesh's departure only prompts it to culminate in passionate lovemaking. The wife metamorphoses once again into a mistress, a concubine without the knowledge to guilt her because she has come to recognize that all-encompassing jouissance- the sexual rupture that merges the physical with the transcendental, verging on mystical effervescent communion. For the first time in her life, she seeks to own her own pleasure - her own narrative. It even

makes its presence felt in her language. If we account for her sexual experiences with her husband as identity, then this sexual experience which falls outside the parameter of knowing transcends into the happy limbo of a non-identity, a world that exceeds the categories of sex and identity. Brinda seems to emanate that rare liberation that perhaps Cixous wrote of in her *The Laugh of Medusa*: "I…overflow, my desires have invented new desire, my body knows unheard-of songs. Time and again… I have felt so full of luminous torrents that I could burst-burst with forms much more beautiful than those which are put up in frames and sold for a stinking fortune" (Selden 145)

Even now Brinda is blissfully unaware of the caste that she seems to have left behind. Her body bears no shame because she does not equate her actions with guilt. In the scene where she sits in front of Nikhilesh covering her almost bare bosom, her convalescences are mere self-defensive hysterical outbursts, the garb of morality once again clothing her in shame that she vehemently refuses to wear. Her identity is still swaying. When Brinda comes to know of her pregnancy and her medical condition that prevents her doctor from readily agreeing to a miscarriage, her own body's betrayal seems to be apparent- it is the woman's body which must bear the repercussion of sexual intercourse. Her movements are not slow, almost flaccid. When she tells Sandeep, he seems to wonder how? They had been careful, had taken precautions, then how? The bearings of sex on a man's body are few and far between, the man teaching the importance of Hinduism in the rise of India as a nation seems to be irked that he might have fathered another bastard, his pride on fathering a few had already been let known. Brinda's plea to be taken to Patna results in him saying, "You are someone else's wife! On top of that, a Dalit!" Brinda looks down from his face, for the first time made aware of who she will never stop being a Dalit !

The word Dalit hails from Marathi and originally means broken. In Bengali language, the word goes on to mean 'trampled upon'. The Dalit woman is a cultural symbol, a historicized symbol of the tripartite struggle that she faces of her caste, class, and gender. *Manusmriti* said that if an upper-caste man sexually exploited or even raped a Dalit woman it is not an offence, in fact, it is lesser than that of killing an unimportant animal. So, it can be easily rectified. So, Sandeep's seduction of Brinda is free of stigma or the slightest moral abnegation because the derivation of sexual pleasure seems to precede moral dictum which momentarily becomes fluid and only once again can be resurrected upon hearing Bimala's plea. This woman is after all an object which exists for his pleasure- he a high brow Hindu, a flag bearer of *Manusmriti*. Truth is absolute but only when it has been modified enough to be able to be written within the penchant of the historiographer. So, while Sandeep is aware of the origin of Hinduism, he is willing to adhere to a notion of truth that seems viable to extend his political career.

Amulya says to Nikhilesh that it is Brinda who asks the most interesting and baffling questions to Sandeep, which he falters to answer. However, it is interesting to note that while the scenes occur of Sandeep's lectures, we as the audience do not hear a word of it but see the enactment,

the dialogues are replaced by a soft melody. Brinda looks down. Sandeep looks guilty. It is but lover's guilt but also it indicates the very subversion in power politics where a Dalit woman through the dint of her education effortlessly and unthinkingly questions a Brahmin man. Her intelligence and the sheer dint of intellect which subverts hegemony is subverted because of her possession of sexuality.

In her essay 'The Ladies have feelings so...', Arundhati Roy writes, "It's the old Brahmanical instinct. Colonise knowledge, build four walls around it, and use it to your advantage. *The Manusmriti*, the Vedic Hindu code of conduct says, if a Dalit overhears a shloka or any part of a sacred text, he must have molten lead poured into his ears." (Roy120)

And while the fitting nature of punishment could be extended to the female gender, sexual punishment is always the more pertinent which is why rapes and gang rapes against Dalit women are often not even reported. And Brinda's body too places her in a precarious position where the bearings of sexuality are superseded by her own knowledge of her being a Dalit who has transgressed her boundaries.

Nikhilesh is the paragon of benevolence and when she tells him "ami janina bachha ta kar" (I do not know whose child is this), he finally responds by saying "bachhata amar Binnier" (The child is my Binnie's). There is no superfluous theoretical jargon- it is the coming together of a husband and wife, sharing the strength of camaraderie that cannot be broken by an act of infidelity.

Nikhilesh who was conveniently branded to be an armchair socialist by Sandeep, and a betrayer to the Holy Hindu nation in making, Nikhilesh himself with astute equanimity is willing to believe that he is a true representative of the new Secular India just as Sandeep has no qualms in believing that if India needs to move forward then it must be a Hindusrashtra. It is only Brinda's beliefs that vacillate along with her fidelity to her respective partners. The paroxysm of genocidal violence which begins its manifestations at the protest held at India Gate finds its anticlimactic culmination in Nikhilesh's brutal murder at his very doorstep. He never manages to return home from the world, he is gunned down at the very moment he was about to cross the threshold and Brinda when she rushes out and sees her husband's mutilated body lying in a pool of blood she sits down heavily on the very threshold. While Tagore's Bimala is allowed to come back to the protected boundaries of her own home, Brinda must reside somewhere in-between. Her physical presence like her identity must reside within this liminal third space- between the desire and the lived-in truthfulness of crass reality.

The next morning in the final climactic scene where Sandeep, in his image of a Sanatani Hindu, is busy feeding the Indian media unbridled stories of the multiple plausibility behind Nikhilesh's murder, Brinda is quiet. She slowly moves into the secluded vicinity of her treasured bedroom from where she retrieves the gun that Sandeep had given to her for safekeeping, brings it down, and unloads the loaded revolver into his chest. Sandeep's curious position where he in futility endeavours to dissipate the situation before Nikhilesh's murder where he had tried to make them see sense- "sirf dhamkake chod do" (only threaten him and let him

go) fails short of his party's impulse of hegemony due to which things violently fall apart. For many viewers, her silence that never again is likely to break juxtaposed with the act of killing in a cold-blooded manner the cause of her husband's murderer seems to be her subaltern voice finally breaking through and withering away- an affirmation of her Dalit identity. Aparna Sen herself had quoted multiple times how this film is a direct consequence of the murder of Gauri Lankesh. In such politically turbulent times, it is yet to be understood which way does our nation finally swing and the ambivalence regarding Brinda's pregnancy seems to indicate the same notion of the nation being pregnant with the dual possibilities of either progression or rapid regression. Brinda can be perceived as a righteous assassin much like the controversial figure of Nathuram Godse who never ran after killing the Mahatma but patiently waited. He even admitted in his later work that the act of assassination was mainly an act of kindness to save the Mahatma from himself. Brinda seems to be not only filled with a vengeance but also a desire to save Sandeep from himself- from becoming evil incarnate hiding under the garb of the saffron saint. Bimala's pregnant self sits down never to get up as the exasperated cacophony around her dismantles and diminishes, she becomes one. Her body, mind, soul, and spirit all looking inward for answers that might never come. Like Dopdi pushing against Senanayak with her mangled breasts, Brinda sits with the revolver falling from her arms onto the floor as he sinks into despondence. With the advent of her widowhood, post Nikhilesh's death, Brinda is once again Bimala. The death of her upper-caste husband has stripped her off the class and caste privileges that she had so far seamlessly enjoyed without compunction and guilt. Her rise from little Bimala who would squat on the floor stuffing her face with rice and salt and refusing all other food because she knows no other food, comes full circle when she must learn to let go of all her learned privileges and emerges in within the true identity of herself- a Dalit broken woman who nevertheless silences the one voice that threatens to overthrow the truth in her own narrative. Where *Ghare Baire* was a political novel, *Ghare Baire Aj* becomes a pastiche- addressing and undermining real issues by dictums of silence.

Works Cited:

Beauvoir, Simon de. *The Second Sex*. London: Vintage. 2011.

Butler, Judith. *Gender Trouble*. Routledge, 2002.

Cixous, Helene. *The Laugh of the Medusa*. Revd. 1976 version published in Marks, Elaine and de Courtivron. New French Feminism: An Anthology. 1981.

GhareBaireAj. Dir. Sen, Aparna. 2019.

Mazumdar, Rinita. *Feminist Theories: From the Personal to the Political*. Kolkata: Towards Freedom. 2015.

Mulvey, Laura. 'Visual Pleasure and Narrative Cinema'. Web. Accessed May 2020.

Roy, Arundhati. 'The Ladies Have Feelings, So… Shall We Leave It to the Experts' (pg 106-124). *My Seditious Heart*. Penguin Random House. 2019

Selden Ramen. *A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory*. Pearson. 2005.
Soja, Edward. *Thirdspace*. Malden: Blackwell.1996.
Spivak, Gayatri Chakravorty. *The Spivak Reader: Selected Works of Gayatri Chakravorty Spivak*. Edited by Donna Landry and Gerald MacLean. Routledge. 1996.
Tagore, Rabindranath. *The Home and the World*. Translated by Surendranath Tagore. Penguin Books. 2005.

Medhasree Talapatra
Assistant Professor, Department of English, The Heritage College
Ph.D. Research Scholar, Department of Film Studies, Jadavpur University

ISSN: 2249-4332

Information to the Contributors

1. The length of the article should not normally exceed 5000 words.
2. Two copies of the article on one side of the A4 size paper with an abstract within 150 words and also a C.D. containing the paper in MS-Word should be sent to the Editor or by e-mails.
3. The first page of the article should contain title of the article, name(s) of the author(s) and professional affiliation(s).
4. The tables should preferably be of such size that they can be composed within one page area of the journal. They should be consecutively numbered using numerals on the top and appropriately titled. The sources and explanatory notes (if any) should be given below the table.
5. Notes and references should be numbered consecutively. They should be placed at the end of the article, and not as footnotes. A reference list should appear after the list of notes.
   It should contain all the articles, books, reports are referred in the text and they should be arranged alphabetically by the names of authors or institutions associated with those works. Quotations must be carefully checked and citations in the text must read thus (*Coser 1967, p. 15*) or (*Ahluwalia 1990*) and the reference list should look like this :
   1. Ahluwalia, I. J. (1990), 'Productivity Trend in Indian History : Concern for the Nineties', Productivity, Vol. 31, No. pp 1-7.
   2. Coser, Lewis A (1967), 'Political Sociology', Herper, New York.
6. Book reviews and review articles will be accepted only for an accompanied by one copy of the books reviewed.
7. The author(s) alone will remain responsible for the views expressed by them and also for any violation of the provisions of the Copy Rights Act and the Rules made there under in their articles.

Our Ethics Policy : It is our stated policy to not to take any fees or charges in any forms from the contributors of articles in the Journal. Articles are published purely on the basis of recommendation of the reviewers.

For Contribution of Articles and Collections of copies and for any other Communication please contact

Executive Editors
OPEN EYES
S.R.Lahiri Mahavidyalya ,
Majdia , Nadia-741507, West Bengal, India,
Phone-03472-276206.
bhabesh70@rediffmail.com, shubhaiyu007@gmail.com,
srlmahavidyalaya@rediffmail.com
Please visit us at : www.srlm.org

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 18, No. 2, December 2021

Published by :
S.R.L. Mahavidyalaya, Majdia, Nadia, West Bengal, India.
Printed by :

Price : One hundred fifty only